তুফান দরিয়ার পরাণ মাঝি

শিশিরকুমার মজুমদার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

অলংকরণ : সত্যজিৎ রায়

প্রচ্ছদ : মদন সরকার

ভিতরের ছবির ব্লকগুলি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য
'সন্দেশ'-এর সম্পাদকের নিকট কৃতজ্ঞ

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৬৫

স্নেহের মিহির, বিয়াত্রিস্-কে

মেজ মামা।

ও

স্নেহের প্রদীপ-কে

মেজ দাদু।

তুফান দরিয়ার
পরাণ মাঝি

সবার পিছন পিছন ওরাও এসে পৌঁছাল ঘাটে। সারি সারি লম্বা লগি পোঁতা পাড়ের কাদায়। তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা নৌকোগুলো অল্প অল্প দুলছে নদীর ঢেউয়ে। নৌকোগুলোর ওপর দিয়ে আরও দূরে তাকিয়ে থমকে গেল মণ্টু!—জল, জল, যত দূর দেখা যায়, ঘোলা মেটে জল কলকল করে বয়ে চলেছে সাগরের দিকে! এদিক ওদিক দু'পাশে তার শেষ দেখা যাচ্ছে না। কোন দিকে সমুদ্র! কোন দিকে মজিদ মিয়াঁর চর! এই তবে কোপবতী নদী!—যার গল্প সেদিন ওকে বলেছেন ফুলতলি গাঁয়ের সদর আলি সাহেব।

যাত্রীরা ঘাটে এসে দাঁড়াতেই, নৌকোর ছইয়ের ওপর থেকে নেমে এল জন কয়েক লোক। তারস্বরে তারা চিৎকার জুড়ে দিল—

'এই যে, এই যে, এ নাও যাবে ধনেখালি।—চলে এসো। চলে এসো গো।'

'হেদেলগঞ্জ, হেদেলগঞ্জ, দিনমানে পৌঁছে দেবো গো। এস এস, জলদি।'

'তেঁতুলতলি, মামড়াহাটি, চর চন্ননপুর।—দেরি করনি গো। এখুনি ছাড়বে।'

ওদের চিৎকারে কানে তালা ধরার মতো হল। তবুও ভারি ভাল লাগতে লাগল মণ্টু আর সিধুর। কেমন যেন সুর করে ওরা ডাকছে। যাত্রীরা যে-যার মতো নৌকোয় গিয়ে বসতে আরম্ভ করল। প্যাঁচপেঁচে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে সবাইকে গিয়ে

নৌকোয় বসতে হল। বেশ মজার ব্যাপার!

পথের আলাপী বুড়ো মুসলমানটি কেশব ডাক্তারের কাছে এসে বলল, 'ঐ যে সবচেয়ে বড় লাওখানা দেখছেন, ওটাই পরাণ মাঝির লাও।—যান, লেবে গিয়ে ওর সাথে কথা বলুন, দেখুন আজ ও নেযাবে কিনা।'

বলেই হাঁক পাড়ল বুড়ো, 'হেইগো পরাণ মাঝি, বাবুরা বড় চরের হাওয়া অপিসে যাবেন গো। তোমার সাথে কথা বলতে চান।'

হাঁক শুনে নৌকো থেকে কে যেন সাড়া দিল—'দাঁড়াতে বলগো। লাও আমরা এগিয়ে নে যাচ্ছি।'

'তাহলে আপনারা এখানে আমার সাথেই অপিক্ষে করুন।' বলল বুড়ো। 'অন্য লাও ছেড়ে গেলে পরাণ তার লাও এনে বাঁধবে এখানেই। তখন কথা বলবেন।'

আরও কত যাত্রী এল। একে একে তারাও সবাই গিয়ে বসল এক একটা নৌকোয়। দেখতে দেখতে পাল তুলে দিয়ে একে একে নৌকো ভেসে যেতে লাগল। অবাক হয়ে তাই দেখতে লাগল মন্টু আর সিধু। ভাগ্যিস্ রেলগাড়িতে যেতে হবে না ওদের। তাহলে তো এমন নদী, এমন নৌকো ওরা দেখতে পেত না।

এক এক করে সব নৌকো চলে গেলে, বড় নৌকোখানা আরও এগিয়ে এসে থামল ওদের সামনে। একটা রোগামতো লোক লাফ দিয়ে কাদায় নেমে একটা লগি মাটিতে পুঁতে তার সঙ্গে বাঁধল নৌকোখানা। কাদা পায়েই পারে উঠে এসে বলল, 'কই, কারা যাবেন মজিদ মিয়াঁর চরে?'

কেশব ডাক্তার বললে, 'আমরা যাব। আমরা তিন জন।'

বুড়ো মুসলমানিটি বলল, 'আমিও আছি গো মাঝি তোমাদের লাও-এর যাত্তিরি। যাব কোদালী।'

লোকটা বলল, 'আজ তো বড় চরে যাবার দিন লয়। আজ যাবে কোদালীর চর হয়ে বাঘমারির চর। তা আপনাদের বাঘমারির চর অবধি পৌঁছে দিতে পারি।'

ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কিন্তু বিদেশ বিভূঁয়ে তাহলে থাকব কোথায় আমরা? বড় বিপদে পড়ব যদি আমাদের পৌঁছে না দাও।'

লোকটা কিছুক্ষণ কি ভেবে বলল, 'সে আমি তো কিছুটি বলতে পারবনি। সবই বড় মাঝির ইচ্ছে। আপনি বলুন তাকে।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই নৌকোর ছইয়ের ভিতর থেকে বার হয়ে এল একজন কাল কুচকুচে মানুষ। ইয়া লম্বা দড়ির মতো তার চেহারা। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে পতিতপাবন, কি বলতেছে বাবুরা?'

পতিতপাবন চেঁচিয়ে উত্তর দিল, 'বাবুরা মজিদ মিয়াঁর চরে যাবেন বলতেছেন গো, নেবে তুমি ওদের বড় মাঝি?'

একথার কোনো উত্তর না দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগল বড় মাঝি। অনেকক্ষণ দেখে বলল, 'আজ আকাশের যা আবেস্থা, দেখ অন্য কোন যাত্তিরি আসে কিনা। যাত্তিরি হলে নে যাব নয়। উঠে আসতে বল লাওয়ে।' বলেই লোকটা আবার গিয়ে ঢুকল ছইয়ের মধ্যে।

পতিতপাবন খুশি হয়ে বলল, 'আসুন তাহলে আজ্ঞে, আপনারা। বড় মাঝি যখন বলতেছে, পৌঁছে দেবে আপনাদের।'

লোকটা কাদা ভেঙ্গে আবার গিয়ে উঠল নৌকোয়। একটা বড় তক্তা পাটাতন থেকে টেনে এনে আড়াআড়ি ফেলল কাদার ওপরে। বলল, 'সাবধানে আসুন বাবু, আপনারা।'

অনেক কায়দা করে কাদা বাঁচিয়ে উঠল ওরা নৌকোয়। কেশব ডাক্তার, তাঁর ছেলে মণ্টু আর মণ্টুর বন্ধু সিধু। আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো মুসলমানটি।

ডাক্তারবাবু ছইয়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমিই পরাণ মাঝি ?'

মাঝি এক পাশে সরে বসে ওদের সবাইকে বসতে বলল। বলল, 'এজ্ঞে, এ অধমের নাম পরাণ বটে। এ গাঙ্গেই আমার চিরটা জীবন কেটেছে।'...নিজের পরিচয় দিয়েই পরাণ জিজ্ঞাসা করল। 'তা এজ্ঞে, আপনারা মজিদ মিয়াঁর চরে যাচ্ছেন যে বটে ?'

'ওখানকার হাওয়া অফিসের বড় সাহেব আমার বন্ধু,' বললেন ডাক্তারবাবু, 'সেখানেই এই ছ'জনকে নিয়ে যাচ্ছি বেড়াতে।'

'তাই বলুন, কবীর সাহেব আপনার বন্ধু নোক! তখন তো আপনি আমাদের আপনজন। নে যাব, যত কষ্টই হোক আমার, নে যাব আপনাদের। তবে অন্য সব যাত্তিরি এলে তবে।'

কথা শেষ করে বিড়ি ধরাল পরাণ। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ওরে পতিতপাবন, লবাব পুত্তুররা সেই যে গেল আসছি বলে, এখনও এলো নি কেন রে ?'

ছইয়ের ওধার থেকে পতিতপাবন বলল, 'বাজারে আগুন লেগেছে গো বড় মাঝি। জিনিসপত্তরের দরদাম করে আসতে দেরি হতেছে তাই। ওরা এল বলে। কিন্তু আকাশের যা হাল, এখুনি বিষ্টি নাবল বলে।'

'তা যা বলেছিস,' বলল পরাণ মাঝি। তারপর আবার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডাক্তারবাবুকে বলল, 'তা হক বলতে বাবু, সময়টি ঠিক বড়গাঙ্গে যাবার লয়। এই আকাশের হাল, তুফান উঠলে বড় দরিয়ায় পব্বত পোমান ঢেউ উঠবে। সে বড় ভীষণ আবেস্থা।'

'যেতে তুমি মানা করছ মাঝি ?' জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু।

বাইরের আকাশের দিকে ভাল করে তাকিয়ে আবার দেখল পরাণ মাঝি। এ গাঙ্গে তার জীবন কেটেছে ছেলেবেলা থেকে। সেই কবে কোন জোয়ান বয়সে দাঁড় ছেড়ে হাল ধরেছে ও, তা

আর মনে পড়ে না আজ। এ গাঙের সব কিছু ওর চেনা। চেনা ওর এখানকার আকাশ বাতাস। তাকিয়ে দেখল, দক্ষিণের সারা আকাশটা জুড়ে এদিক ওদিক যতদূর নজর যায় মেঘ আর মেঘ। ঘন কাল জমাট বাঁধা মেঘ। তখনি যেন ওকে জানান দেবে বলে হাওয়া ছাড়ল। ঠাণ্ডা হাওয়া। বুক ভরে সে হাওয়ায় নিশ্বাস নিল পরাণ। বলল, 'নাঃ! আজ আর গতিক ভাল মনে হতেছে না। হ্যাঁরে পতিত, হাওয়া অপিস কি কোনো খপর পাঠিয়েছে থানায়?'

পতিতপাবন বলল, 'এইতো কিছুক্ষণ আগে হাবিলদারের সাথে দেখা, যে বললে, বিষ্টি হবে খুব। তুফানের ভয় নেই কোনো। বড় দরিয়া ঠাণ্ডা থাকবে গো।'

একথা শুনে মাথা নাড়ল পরাণ। বলল, 'কি জানি হাওয়া অপিসের কলের খপর কি বলতেছে! তুফান উঠলে সব্বোনাশ হবে যে গো। মাছ মারার লাওগুলো গাঙে বার হয়ে গেছে। তুফানে হাল ধরার মাঝি কে আছে তাদের?'

'তুমি মিছে বড় ভাব, বড় মাঝি!' বলল পতিতপাবন। 'বিলিতি কলের খপর কি কখনো মিথ্যে হতে পারে? বিষ্টি হবে খুব দেখো, তারপর আকাশ পোস্‌কার হয়ে যাবে। রাত্তিরে আর ঝড় তুফান হবেনি।'

ওদের কথা শুনতে ভারি ভাল লাগছিল মণ্টু আর সিধুর। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল পরাণ মাঝিকে! রোগা লম্বা চেহারা, ভীষণ কাল কুচকুচে রং। গায়ের পেশীগুলো শক্ত দড়ির মতো পাকান। তাকালে বোঝা যায়, ছোট করে কাটা চুলগুলো ওর সাদা ধপধপে। বয়স কম করে ষাট হবে। ছইয়ের একধারে বসে মনের সুখে বিড়ি টানতে টানতে কথা বলছে খুব ভারিক্কি চালে।

'ভাবি কি সাধে রে পতিত!' বেশ চিন্তা নিয়েই বলল পরাণ

মাঝি, 'আজকালকার ছাওয়াল ছোকরারা শুধু বৈঠে মেরে লাও চালাতেই শিখেছে। মেঘ হাওয়ার গতিকে বোঝার বুদ্ধি কি তাদের আছে! মরবে সব যদি তুফানের মাঝে পড়ে।'

'এমন কি প্রতি বছর হয় নাকি!' থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু।

'হয়নি আবার! পিতি বছর হয়।' বললে পরাণ মাঝি। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'কত করে ডেকে বলি সবাইকে, ওরে বাবা-সকল, বয়স তো আমার কম হল নি, আমার কথাটা শোন। নিজেরা যদি না বুঝিস তো রোজ থানা থেকে হাওয়ার খপর নে আসবি। সেই বুঝে কাজ করলে তো আর বেঘোরে পরাণটা দিতে হয় না! তা কে শোনে কার কথা! আবার বলে কি জানেন বাবু?'

'কি বলে?' জানতে চাইলেন ডাক্তারবাবু।

'আড়ালে আমাকে নে হাসি-তামাসা করে, বলে বুড়োর হাড়ে ভয় ঢুকেছে দরিয়ার, শোন কথা!' কথার শেষে পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, গুছিয়ে বসে বলল পরাণ, 'তা এও বলি, ঐ সব সরকারি খপরের অনেকটাই তো ভুল। যে দিন বলে আজ তুফান উঠবে সেদিন ওদে পরাণ ফাটে। আর যেদিন বলে আজ কোনো ভয় লেই, সে দিন তুফান আসে ক্ষেপা পাগলের মতন। কত লোকে যে ঠকেছে, মরেছে, তার কি ঠিক আছে বাবু। তবে আজকালের কথা অন্য!'

'কেন, অন্য কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু।

'সেই যে সে বছর ভুল খপর দেবার জন্যি তুফানের মাঝে পড়ে দশ-বিশ জন আর ঘরে ফিরলনি, তা নিয়ে কত লেখালেখি হল! ঝাণ্ডাওয়ালা বাবুরা কত সভা-সমিতি করে গরম বক্তিমে দিল। শেষে ম্যাজিষ্টর সাহেব এল। কত বড় বড় এন্‌জিনিয়র এল, সবাই বললে, নতুন হাওয়া অপিস চাই! তাই তো মজিদ

মিয়াঁর চরের জঙ্গল কেটে কোটা বাড়ির মধ্যি বসল কত সব বিলিতি যন্তর-মন্তর। তুফানের খপর আগাম ধরবে বলে, আর সে সব কিছুর সাথেই তো এল কবীর সাহেব, ঐ সব যন্তরগুলো দেখবে বলে।'

পতিতপাবন ছইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে বড় মাঝির কথাগুলো সব শুনছিল। ও আর থাকতে না পেরে বলল, 'সেই থেকে ওজ থানায় খপর আসে, সকাল সন্ধি, হাওয়ার খপর। তা কবীর সাহেব আকাশ দেখেই খপর দেন ওজ। এখন আর তত মিথ্যে বলে না হাওয়া অপিস।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। আর তার সঙ্গে ভীষণ জোরে বইতে লাগল হাওয়া। ছই-এর মধ্যে তীরের বেগে ছাঁট ঢুকতে লাগল। গায়ে জল পড়তেই পতিতপাবন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। বলল, 'এ যে সত্যি বিষ্টি শুরু হয়ে গেল, বড় মাঝি। আজ কি তাহলে আর বড় গাঙ্গে যাওয়া হবেনি?'

'দেখ, বিষ্টি থামে কিনা!' বলল পরাণ মাঝি, 'আমার মনে হয় হাওয়া অপিসের খপর ঠিক। বিষ্টি হয়ে মেঘ কেটে যাবে। কিন্তু তারপর কি আর যাত্তিরি আসবে!'

'যাত্তিরি আসবে খনি।' বিজ্ঞের মত বলল পতিতপাবন। 'কোদালীর চর বাঘমারির চরের জনমনিষ্যিরা ঘরে যাবেনি?'

ঝড়খালি থেকে কোদালী তিন ক্রোশ পথ। সেখানে আবাদ আছে। গ্রামও আছে পাঁচ-ছ খানা। গোটা কোপবতী নদীর চরের মধ্যে ঐ এক জায়গাতেই লোকের বসতি খুব বেশি। অনেক আগে চরটায় গভীর জঙ্গল ছিল। সে বহুদিনের কথা। এখন সে জঙ্গল আর নেই। নেই কোনো বুনো জানোয়ারের ভয়। এখন সেখানে বড় বড় আবাদ হয়েছে। মানুষ জন গিয়ে

ঘর বেঁধেছে। কিন্তু কাজে-কর্মেই সেখানকার লোকদের আসতে হয় ঝড়খালিতে। নেই বলতে কিছুই নেই সেখানে। মানুষগুলো থাকে শুধু জমির মায়ায়। ডাক্তার-বদ্যি থানা-পুলিস বাজার-হাট সব এই ঝড়খালিতে। ওখানকার লোকদের ভরসা একমাত্র পরাণ মাঝির নৌকো। পরাণ মাঝিকে তাই এ-অঞ্চলের সবাই ভয় ভক্তি করে। ও না হলে এমন বারদরিয়ায় বড় গাঙ্গে নৌকো ভাসাবে কে ?

সরকার থেকে জঙ্গল কেটে নতুন জমি বিলি হয়েছে বাঘ-মারির চরে। জমির লোভে বহু লোক গিয়ে বাসা বেঁধেছে সেখানেও। কোদালীর চর থেকে বাঘমারি আরও দু-ক্রোশ পথ। সে পথ ভয়ঙ্কর! নদীর একূল-ওকূল দেখা যায় না। জোয়ার-ভাটায় সোঁ সোঁ করে জল ছোটে। জলের সে কি ডাক! মাঝ দরিয়ায় তুফান উঠলে আকাশ ছোঁওয়া ঢেউয়ের বুকে শক্ত হাতে হাল ধরে নৌকো চালায় পরাণ মাঝি। নৌকোর কথা ছাড়া আর কোনো চিন্তা থাকে না তখন ওর মনে! এতগুলো লোকের প্রাণের ভার ভগবান দিয়েছেন ওর হাতে, ওর কি তখন অন্য কথা ভাবা চলে ?

শীতকালে অবশ্য এসব ভয় থাকে না। তখন হাল ধরে মাঝে মাঝে পরাণ গুনগুনিয়ে গান গায়। পালে হাওয়া লেগে নৌকো ছুটে চলে তর তর করে। নৌকোর ধারে বসে তখন পতিতপাবন, ছটকু, বিশে আর আলিমুদ্দিন উদাস দৃষ্টিতে বড় গাঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো তখন ওরা ওদের বাড়ির কথা ভাবে। কত দিন যে ঘরে যায়নি ওরা!

ততক্ষণে হাওয়ার বেগ বেড়েছে। মেঘগুলো হু হু করে এগিয়ে আসছে আকাশ জুড়ে। হাওয়ার তোড়ে দুলতে শুরু করেছে নৌকো। ছোট ছোট ঢেউগুলো ছলাৎ ছলাৎ করে আছড়ে পড়ছে

নৌকোর গায়ে।

ব্যাজার মুখ করে উঠে পড়ল পতিতপাবন। কোমরের গামছাটাকে কষে বেঁধে তাড়াতাড়ি চলে গেল গলুইয়ের কাছে। দুহাত দিয়ে নোঙ্গরটা তুলে দুবার দুলিয়ে ছুঁড়ে দিল নদীর মধ্যে। হড় হড় করে দড়ি টেনে নিয়ে নোঙ্গরটা ঝপাং করে ডুব দিল জলে। টান করে দড়িটাকে নৌকোর খোঁটার সঙ্গে বেঁধে, আবার এসে ছইয়ের মধ্যে ঢুকল পতিতপাবন। ভিজে জবজবে হয়ে গেছে ও ততক্ষণে। ছইয়ের গা থেকে একটা গামছা খুলে এগিয়ে দিল পরাণ মাঝি। বলল, 'কঁ্যাথা মুড়ি দিয়ে বোস্ রে, পতিত। আমার শুদ্ধ হাড়ে কাঁপুনি ধরল রে।'

গা হাত পা মুছে কঁ্যাথা মুড়ি দিয়েই বসল পতিতপাবন।

মণ্টু চুপি চুপি বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ যাওয়া হবে তো, বাবা ?'

একথাটা শুনতে পেল পরাণ। এক গাল হেসে বলল, 'এ লৌকো যে-সে লৌকো লয়, বাবা। এ বলে গিয়ে খাস সরকারি লৌকো। ডাকের লৌকো বলতে পার তুমি। কোদালী আর বাঘমারির ডাক যদি দে যায় পিওন তাহলেই আমি লৌকো ছাড়ব। তবে এত বিষ্টিতে কি আর কোনো যাত্তির আসবে ? না এলে মিছিমিছি শুধু তোমাদের নে অত দূরের পথ যাই কি করে, বাবা ? তবে সময় আছে, দেখ, বিষ্টি থামলে হয়।'

সিধু বলল, 'আমার কিন্তু বেশ লাগছে, মণ্টু। তোর লাগছে না ? এমন করে বৃষ্টির সময় নৌকোর ছইয়ের মধ্যে বসে থাকবি তা ভেবেছিলি কখনো ?'

'আমারও খুব ভাল লাগছে।' বলল মণ্টু, 'কিন্তু নৌকো ছাড়লে আরও ভাল লাগত।' কথা শেষ করে ও পরাণ মাঝির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মাঝি, মজিদ মিয়াঁর চর এখান থেকে কত দূরে হবে ?'

মনে মনে হিসাব করে পরাণ মাঝি বলল, 'তা হবে বাবা, পেরায় ছ'কোশের পথ। যেতে যেতে আত হয়ে যাবে, বাবা। বড় গাঙ্গে লৌকো বাওয়া কি চাট্টিখানি কথা?' আবার বিড়ি ধরাল পরাণ মাঝি।

বাইরে বৃষ্টি যেন হঠাৎ কমে গেল। তাই দেখে কাঁথা ফেলে পতিতপাবন নড়ে চড়ে বসল। পরাণ মাঝি ছইয়ের ফাঁক দিয়ে আবার ভাল করে আকাশ দেখল। বিড়িতে ঘন ঘন টান দিয়ে বলল, 'বিষ্টি থামল না কি রে পতিত? দেখ দেখ।'

পতিতপাবন ঝুঁকে পড়ে দেখে বলল, 'তাইতো মনে লিতেছে গো, বড় মাঝি! দরিয়ার পীর বাবা বুঝি মুখ তুলে তাকাল গো।'

হঠাৎ বৃষ্টি সত্যিই থেমে গেল। একঘেঁয়ে বৃষ্টির শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকোর গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ বাড়ল। বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরাণ মাঝি লাফ দিয়ে ছইয়ের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক আকাশের দিকে তাকিয়ে মহা খুসিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'জয় দরিয়ার পীর বাবা!' মহা ভক্তিতে কপালে দু'হাত ঠেকাল পরাণ।

সিধু বলল, 'তাহলে আমরা যাচ্ছি রে, মণ্টু।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'দেখ এখন যাত্রীরা এলে হয়। শুধু আমাদের নিয়ে তো ওরা যাবে না।'

বাইরে থেকে পরাণ চেঁচাল, 'হ্যারে পতিত, লবাব পুত্তুরদের এখনো দেখা নেই কেন রে? ঝড়খালির গোটা বাজার ওরা মাথায় করে নে আসবে নাকি রে?'

পতিতপাবন বলল, 'এইতো বিষ্টি থামল, বড় মাঝি। এখনি ওরা এল বলে।'

নদীর পারের পথে দেখা গেল একদল লোক বাক্স বিছানা মাথায় করে আসছে ঘাটের দিকে। তারা কাছে আসতেই, দূরে দেখা গেল আরও অনেকে আসছে সার বেঁধে।

তাই দেখে মহা খুসিতে মন্টু বলল, 'ঐ দেখ বাবা, যাত্রীরা সব আসছে। এবারে নিশ্চয়ই নৌকো ছাড়বে ?'

বাইরে পরাণ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে পত্তিত, যাত্তিরিরা সব আসতে লেগেছে। চট করে তুই তক্তাটা ঠিক করে দে রে। আর যাত্তিরিরা উঠলে লোক গুনতি পয়সাগুলো আদায় করে নিস।'

পরাণ কিন্তু যাত্রীদের দিকেই গেল না। ছই ধরে দাঁড়িয়ে আবার বার বার আকাশ দেখতে লাগল। আকাশের কাল মেঘ এখন দেখতে পাতলা হলেও দিগন্ত ছেয়ে রয়েছে। সেই মেঘের দিকে তাকিয়ে কি যেন ও বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল।

যাত্রীরা এক এক করে কাদা ভেঙ্গে এসে পাটাতনের ওপর পা ধুয়ে যে যার জায়গা দেখে বসে পড়তে লাগল। তাই দেখে ছই থেকে বাইরে এসে বসল মন্টু আর সিধু। ডাক্তারবাবুও আর ভিতরে বসে রইলেন না।

সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত মনে হচ্ছিল মন্টু আর সিধুর। এমন দেশ, এমন নদী আর তার বুকে এমন যে একখানা নৌকো থাকতে পারে তা ওদের কল্পনাতেও ছিল না। কখনও কি ওরা ভাবতে পেরেছিল পরাণ মাঝির নৌকো চেপে ওদের যেতে হবে বড় গাঙ্গ পার হয়ে বার দরিয়ায়! যেখানে হাওয়া উঠলে ঢেউ ওঠে আকাশ ছোঁওয়া !

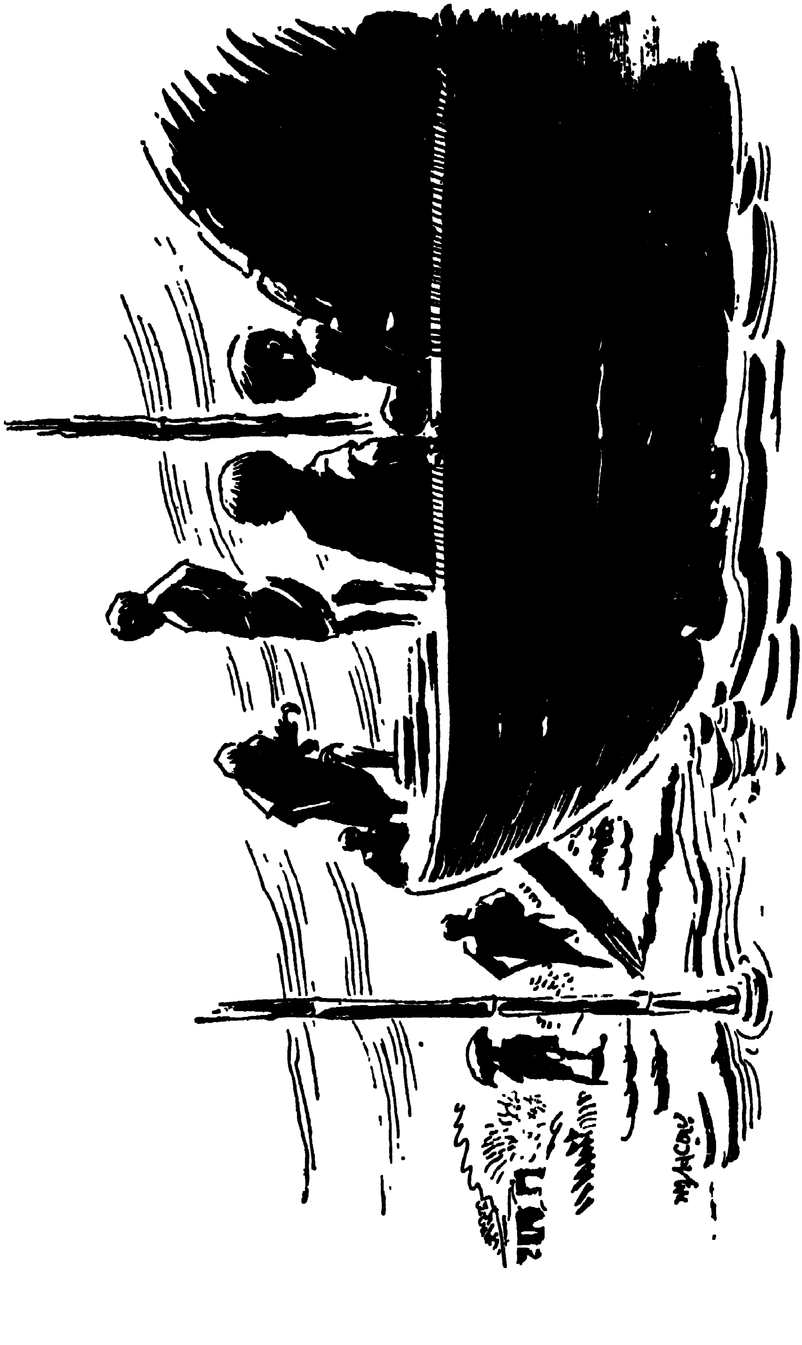
যাত্রীরা নৌকো জুড়ে বসেই হট্টগোল শুরু করল।

'কই মাঝি আর দেরি কেন, ছাড়।'

'এত দেরি করলে কখন পৌঁছাবে বাঘমারি ?'

কে যেন একজন ওদিক থেকে ফস্ করে বলে বসল, 'পথে আবার তুফান উঠলে বিপদ হবে।'

ওর কথা শেষ হতেই ধমকে উঠল পরাণ মাঝি, 'তোমার আক্কেলখানা কেমন গো? দরিয়ার পীর বাবার নাম নে লাও



ছাড়ব আমি, তার বিপদ হবে কেনে ?'

অন্য যাত্রীরাও সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে ধমকাতে লাগল। সেই বুড়ো মুসলমানটি ছই-এর কোণে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। বলল, 'আরে বড় মাঝি, ও সব ছাওয়ালদের কথায় কান দাও কেন ? ওরা জানে কি! যে লায়ে পরাণ মাঝি আছে সে লাও পড়বে বিপদে !'

অন্য অনেকেই ওর কথাতে সায় দিল। মনের ভয় কিন্তু কারও গেল না। মনে মনে সবাই দরিয়ার পীর বাবাকে নমস্কার জানাল।

বুড়ো মুসলমানটি মন্টু আর সিধুকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের কেমন লাগতেছে গো, আমাদের দেশ আর মানুষ জন ?'

সিধু বলল, 'খুব ভাল।'

'মজিদ মিয়াঁর চরে তোমাদের কি কাজ ?' জিজ্ঞাসা করল বুড়ো।

'বেড়াতে যাচ্চি,' বলল মন্টু।

'তোমরা বেড়াতে যেতেছ—এ্যাঁ !'—অবাক বুড়ো যেন কথাটা বিশ্বাসই করতে পারল না।

'হ্যাঁ, ওখানকার হাওয়া অফিসে বেড়াতে যাচ্ছি,' বলল মন্টু।

'তা ভাল,' বলল বুড়ো। 'তোমরা এসেছ আমাদের দেশ-গাঁ দেখতে। শহুরে বাবুরা এমন আসে না। আর দেখার আছে কি এখানে। জল, জল, আর জল। তার মাঝে মাথা তুলে আছে তিনটে চর। গেঁয়ো চাষা-ভুষোর দেশ। তা আবার মজিদ মিয়াঁর চরে আবাদও নেই।'

সিধু বলল, 'আমরা তো মজিদ মিয়াঁর চরের হাওয়া আপিসেই যাচ্ছি।'

'ঐ হাওয়া আপিস হওয়ার পর থেকেই তো ওখানে লাও যেতেছে,' বলল বুড়ো, 'আগে লাও যেত বাঘমারির চর ওবদি।

সেবারের ঝড়ের পর যখন হাওয়া আপিস বসল মজিদ মিয়াঁর চরে, কবীর সাহেব তার বেয়ারা আরসাদকে নে গেল সেখানে সে আপিস দেখবে বলে। ম্যাজিস্টর সাহেবের আপিসে তখন ডাক পড়ল পরাণ মাঝির। সাহেব বললেন, 'শুনেছ তো মাঝি, সব কথা। এবার থেকে হপ্তায় দুদিন করে তোমাকে যেতে হবে মজিদ মিয়াঁর চরে সরকারি কাজে। তুমি ছাড়া একাজ আর কাউকে দিয়েই হবে না।'

মণ্টু থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? আর কি কোনো মাঝি ছিল না এখানে যে অত দূরে যেতে পারে?'

'মাঝি থাকবে নি কেন!' বলল বুড়ো, 'তাদের সাথে পরাণ মাঝির কথা তোলো না! বার দরিয়ায় লাও নে যাবে সে বুকের পাটা ঐ একজনেরই আছে। বড় গাঙের পীর বাবার দহের কথা ভেবে বাঘমারি ছেড়ে লাও নিয়ে আর কেউ আগোয় বাড়ে না। তারা যাবে মজিদ মিয়াঁর চরে!'

সিধু জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা শুনে পরাণ মাঝি কি করল?'

'ম্যাজিস্টরের কথা শুনে পরাণের বুকখানা দশ হাত হয়ে গেল,' বলল বুড়ো, 'কথাটা সাহেব তো মিথ্যে বলেনি। এ দরিয়া, এ গাঙকে তো চেনে এক পরাণ মাঝিই। সেই থেকে ঝড়খালির পরাণ মাঝি লাও নে যায় নে আসে মজিদ মিয়াঁর চরে। আজ হয়তো তোমাদের নে যাবে।'

'যাত্রীরা তো সব এসে গেল। নৌকো এখনো ছাড়ছে না কেন?' জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু, 'আর কত দেরি করবে ওরা?'

'মেঘের গতিক না বুঝলে পরাণ লাও ছাড়বেনি বাবু!' বলল, বুড়ো।

ওদিক থেকে তখনি পতিতপাবন বলল, 'আমি পাড়ে নাববো বড় মাঝি? দেখব ওরা এসতেছে না কেন? আমি যাব

আর আসবো।'

'না না, লাববিনি।' চেঁচিয়ে উত্তর দিল পরাণ মাঝি। বলল, 'ওরা এসবেখনে। আমি মেঘের গতিক না বুঝে লাও ছাড়বনি। তাতে দেরী হবে হোক।'

পতিতপাবন যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করতে লেগে গেল, আর তাদের এদিক ওদিক সরিয়ে বসিয়ে নৌকোর সব দিকের ভার সমান করল।

ওর কাজ শেষ হতে বেশ সময় লাগল। এমন সময় দূরের পথে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে আসছে চারজন লোক। পতিত-পাবন তাদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে গো বড় মাঝি, লবাব পুত্তুররা এসতেছেন এতক্ষণে।'

পরাণ মাঝি বলল, 'ছট্‌কু বিশে আর আলিমুদ্দিনকে তো চিনলাম রে পতিত, কিন্তু সঙ্গের লোকটা কে? পরণে উর্দি আছে মনে হতেছে!'

'তবে বোধহয় আজ ডাক আছে। চিঠিনে পিওন আসতেছে বড় মাঝি,' বলল পতিতপাবন। 'তা না হলে বোধহয় কোদালীর বন আপিসের লোক।'

'সে আবার কেন রে?' জিজ্ঞাসা করল পরাণ মাঝি। 'কোদালীর কেউ আবার বনে গাছ কেটেছে নাকি রে?'

'কে জানে। দেখ আগে কে এসতেছে। এসলেই সব বোঝা যাবে,' বলল পতিতপাবন।

ওরা চারজন হুড়মুড় করে নৌকোতে উঠতেই পরাণ মাঝি চেঁচাতে সুরু করল, 'হতচ্ছাড়া ড্যাক্‌রা, তোদের এতক্ষণে এসতে মন হল। গেছলি কোন চুলোয় শুনি?'

মুখ কাঁচুমাচু করে আলিমুদ্দিন বলল, 'রাগ করনি, বড় মাঝি। আমরা তো ঠিক এসতেছিলাম। পোস্টো ম্যাস্টরবাবু যে আমাদের এটকে দিলেন। সরকারি রেজেস্ট্রী নিয়ে পিওন ভাইকে যেতে

হবে মজিদ মিয়াঁর চরে আজই, জরুরি চিঠি। ও এদেশে নতুন নোক, তাই আমাদের সাথে পেঠিয়ে দিলেন। তাইতো দেরী হল।' কথার শেষে ওরা ওদের জিনিসগুলো সব নিয়ে রাখল ছইয়ের ভিতরে।

উর্দিপরা লোকটা বলল, 'হ্যাঁ মাঝি ভাই, ওদের কোনো দোষ নেই। জরুরি এ চিঠি আজ নে যেতেই হবে। চিঠির কাগজ বানাতেই দেরী হল এত।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল পরাণ মাঝি, 'তা হ্যাঁরে আলি, থানা থেকে হাওয়ার শেষ খপর এনেছিস? না তা ভুলে গেইছিস?'

'না ভুলিনি গো, বড় মাঝি,' বলল আলিমুদ্দিন। 'তুফানের খবর নেই কোনো। বিষ্টি হতে পারে। এখন দরিয়ার পীর বাবা যা করেন।'

'তবে আর কি,'—চেঁচিয়ে উঠল পরাণ মাঝি। 'লাও খুলে দেরে, পতিত। তোরা লগি ধর রে। বেলা অনেক হয়েছে।'

ছট্‌কু আর বিশে দুখানা লগি নিয়ে দাঁড়াল নৌকোর দু'পাশে। পতিতপাবন টান মেরে তক্তাখানাকে তুলে দিল পাটাতনের ওপর। তারপর লাফ মেরে কাদায় নেমে নৌকো ঠেলতে লাগল। পিছনে গলুইয়ের কাছে গিয়ে আলিমুদ্দিন নোঙ্গরের দড়ি হিড়হিড় করে টেনে তুলতে লাগল ওপরে। পরাণ মাঝি কোমরের গামছা-খানাকে কষে বেঁধে ধরল গিয়ে নৌকোর হাল। নৌকোটা একটু দুলে উঠে আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল জলের দিকে।

সব কিছু উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছিল মণ্টু আর সিধু। মুখে ওদের কোনো কথা ছিল না। ওরা যেন স্বপ্ন দেখছিল। এই নৌকো, নদী, মানুষজন, আর পরাণ মাঝি, সব কিছুই স্বপ্নরাজ্যের!

'এই, ভয় করছে তোর?' চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল সিধু।

'তোর?' উল্টে জিজ্ঞাসা করল মণ্টু।

'একটু একটু। আকাশে যা মেঘ!' বলল সিধু।

'আমারও', বলল মন্টু, 'ভয় করছে বলেই আরো ভাল লাগছে।'

সরসর করে মাটি ছেড়ে নৌকো এগোতে লাগল। এখুনি জলে পড়বে। পতিতপাবন প্রাণপণে ঠেলছে নৌকো, আলিমুদ্দিন হড়হড় করে টেনে তুলছে নোঙ্গর। হঠাৎ ছলাৎ করে আওয়াজ তুলে নৌকো ভীষণ দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই পতিতপাবন লাফ দিয়ে উঠে পড়ল নৌকোয়। হিন্দু-মুসলমান নৌকোর সব যাত্রীরাই তখন হঠাৎ এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। 'বদর বদর। —সাত দরিয়ার পীর বাবা আমাদের ভুলো না, বাবা। বড় গাঙ্গ হেলায় পার করে দিও, বাবা।'

চেঁচানো বন্ধ করে সবাই হাত তুলে পীর বাবাকে প্রণাম করল। মন্টু আর সিধু অবাক হয়ে দেখল ডাক্তারবাবুও হাত তুলে কপালে ঠেকালেন। পরাণ মাঝি চেঁচিয়ে উঠল—'নোঙ্গর তোল রে আলি। ওরে তোরা লগি মার, মার লগি। লাও-এর মুখ যেন না ফিরে যায়।'

ঝপাৎ করে নোঙ্গরটাকে তুলে ফেলল আলিমুদ্দিন। নোঙ্গরের দড়ি গোল করে গুটিয়ে রাখতে লাগল পতিতপাবন। ছট্‌কু আর বিশে সারা শরীরের ভার লগির ওপর ফেলে লগি ঠেলে নৌকোর গলুই থেকে মুড়ো অবধি আসতে যেতে লাগল।

'আমরা চলেছি রে, সিধু।' মহা খুশি হয়ে বলল মন্টু, 'দেখছিস না, নদীর তীর দূরে সরে যাচ্ছে।'

'তাই তো রে! নৌকোটাও দুলছে বেশ।' বলল সিধু।

বেশ কিছুটা লগি ঠেলার পর, লগি আর তল পেল না। ছট্‌কু আর বিশে লগি শুইয়ে রেখে দিল।

হাঁকল পরাণ মাঝি, 'দাঁড় ধর রে তোরা শিগ্‌গির। আমি লাও-এর মুখ ফেরাব বড় গাঙ্গের দিকে।'

নৌকোর দু'দিকে বসে ছটকু আর বিশে দু'খানা দাঁড় জলে ফেলে ঝপাঝপ বাইতে শুরু করে দিল।

তখনি হালে প্যাঁচ কষিয়ে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিল পরাণ মাঝি। নদীর তীর তখন অনেক দূরে। সামনে বড় গাঙ্গ, 'বার দরিয়া।' সেখানেই কোথাও আছে মজিদ মিয়াঁর চর।

নোঙ্গর গুটিয়ে রেখে পতিতপাবন আর আলিমুদ্দিনও গিয়ে বসল দাঁড় নিয়ে। চারখানা দাঁড় সমানে পড়তে লাগল নদীর বুকে, নৌকো এগিয়ে চলল কোদালীর চরের দিকে। ফুলতলি, ঝড়খালি, সবকিছু পড়ে রইল পিছনে। সামনে শুধু জল আর জল!

বাবা যে ভীষণ চিন্তায় পড়েছেন তা বুঝতে পারল মণ্টু। বলল, 'কিছু হবে না বাবা, দেখো তুমি। আর উঠুক না ঝড়, তবে বেশ মজা হয়।' কথাগুলো ও বেশ চুপিচুপিই বলেছিল, যাতে অন্যরা কেউ শুনতে না পায়।

কিন্তু ওদের কথার মাঝেই পরাণ মাঝি চেঁচিয়ে উঠল, 'বলি ও খোকা বাবা, তোমরা অত ধারে বোসনি। ভিতরে সরে বস। শেষে বিপদ হবে।'

সিধু কাতরভাবে উত্তর দিল। 'আমরা সাবধানে বসব, বড় মাঝি। এখানে বসলে চারদিক বেশ ভাল দেখা যায়।'

'না না বাবা, তা হবার লয়।' বলল পরাণ মাঝি, 'ভিতরে সরে বস বাবা, বিপদের কি কিছু ঠিক আছে। এ দরিয়া আক্ষুসে কাঙ্গটে ভরা! পড়লে তোমাদের আর আস্ত পাওয়া যাবেনি।'

ডাক্তারবাবু এ কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কথা শোন বড় মাঝির। তোমরা ভিতরে সরে এস।'

ইচ্ছা না থাকলেও ওদের সরেই বসতে হল। মণ্টু সেই বুড়ো মুসলমানটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'চাচা, কাঙ্গট কাকে বলে?'

আপন মনে কি যেন ভাবছিল বুড়ো। প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকাল। সাদা ধপধপে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল,

'কাঙ্গট? ঐ যে তোমরা যাকে বল হাঙ্গর, এদিকে তাকেই সবাই বলে কাঙ্গট। ও বড় ভয়ানক পেরাণি। এ দরিয়া ভরা কাঙ্গটে।'—ওদের কথার উত্তর দিয়ে, বুড়ো ডাক্তারবাবুকে বলল, 'যেতেছেন বেড়াতে বাবু, কিন্তু দু'দিনেই হেঁপিয়ে উটবেন। খালি সমুদ্দুর আর সমুদ্দুর। হাওয়া আপিস ছাড়া ও দ্বীপে আর জনমনিষ্যি থাকে না! হপ্তায় দুদিন খালি পরাণ মাঝি যায়।'

'আমরা সমুদ্র দেখিনি।' বলল মণ্টু।

পরাণ মাঝি তখনি হেঁকে উঠল। 'ওরে পাল তুলে দে রে।' হুকুম শুনে আলিমুদ্দিন আর পতিতপাবন দাঁড় তুলে রেখে পালের দড়ি ঠিক করতে লেগে গেল। দড়া-দড়ি ঠিক করে দড়ি টেনে ঘর্ ঘর্ করে পাল তুলে দিল মাস্তুলে। হাওয়ার চাপে ফুলে উঠল পাল। দড়ির শেষ শক্ত করে খোঁটায় বাঁধল আলিমুদ্দিন। হালে তখন মোচড় দিয়ে পরাণ মাঝি নৌকো তুলে দিল হাওয়ার মুখে। অনেক দুলুনি খেয়ে নৌকো যখন স্থির হল, তখন তার গতি বেড়ে গেছে। ছট্কু আর বিশে দাঁড় তুলে ফেলল। ঘামে ওদের সারা দেহ আর পরনের কাপড় ভিজে জবজবে হয়ে গেছে! কোমর থেকে গামছা খুলে ওরা ঘাম মুছতে লাগল। পরাণ মাঝি ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে বলল। 'হাঁড়িতে ভাত আছে। যা, তোরা এক এক করে খেয়ে নে গিয়ে। আমি রইনু হালে। মিছে দেরি করিসনে, বুঝলি।'

ওরা চার জনেই হাসি মুখে নৌকোর ছইয়ের মধ্যে ঢুকে গেল। বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু, আপনারা সব খেয়ে এসেছেন তো?'

'না তো।' বললেন ডাক্তারবাবু, 'পথে কিছু কিনতে পাওয়া যাবে না?'

'হা অদ্দেষ্ট!' অবাক বুড়ো বলল, 'লাও তো সোজা যাবে কোদালীর চর। এদিকে দোকানপাট কোথায়! খাবেন কি?'

'তা হলে?' ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু।

'তা আমার সাথে কিছু চিঁড়ে গুড় আছে।' বলল বুড়ো। 'কষ্ট করে তাই চিবোবেন খনে। নইলে তো ছাওয়ালেরা উপুস থাকবে।'

'মজিদ মিয়াঁর চরে আমরা পৌঁছাব কখন?' জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু।

'সে তো আত্তির হয়ে যাবে বলে মনে হতেছে।' বলল বুড়ো, 'তা ভাবনা কিসের? সরেস চিঁড়ে আর ঘরের গুড়—ভাল লাগবে আপনাদের। তবে হ্যাঁ, এ আমাদের গরীব লোকের খাদ্যি।'

নৌকোর অন্য যাত্রীরাও তখন আপন আপন পুঁটুলি খুলে চিঁড়ে চিবোতে আরম্ভ করেছে। পুঁটুলি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুখও খুলে গেল। চাষ-আবাদ আর বড় গাঙের কথাই ওদের আলোচনার বিষয়।

নিজের পোঁটলা খুলে সবাইকে চিঁড়ে গুড় ভাগ করে দিল বুড়ো। 'খাও বাবা, তোমরা খাও। একটু কষ্ট হবে, তা কি করবে বল।'

পোস্ট অফিসের পিওন এপথে নতুন যাচ্ছে। সে বেচারাও সঙ্গে করে কিছুই আনেনি। পরাণ মাঝির তা নজর এড়াল না। ডেকে বলল—'ওরে পতিত, তোরা তো সব গিলতে লেগেছিস। তা পিওন ভাই কি উপোস দে মরবে নাকি রে? কোনো দিকে যদি তোদের নজর থাকে।'

ছইয়ের ভিতর থেকে পতিতপাবন ডাকল। 'এসো ভাই, ভিতরে এসো। ডাল-ভাত চাট্টি খেয়ে যাও।'

ডাক শুনে পিওন খুশি মনেই ছইয়ের মধ্যে ঢুকে গেল।

চিঁড়ে চিবোতে চিবোতে বুড়ো বলল, 'এদিকের কিছুই তো তোমরা জান না, শোন তোমাদের ইদিকে সব খবর শুনিয়ে দি। এই নদীর নাম কোপবতী কেন শোন, আদ্যিকালে হেথায় এক

রাজা রাজিত্তি করতেন। তার না ছিল ধম্মে ভয়, না মানত সে দেব-দেবতা। তার পাপে রাজ্যি যায় যায়। পেজারা সব দেশান্তরী হতে লাগল। রাজার অত্যাচার তাতেও থামল নি। আজ একে ধরে আনে, কাল ওকে সামান্যি কারণে পেরান দণ্ড দেয়! হাহাকার উঠল দেশ জুড়ে। এক গেরামে এক বেরাহ্মণ থাকত। তার এক রূপবতী কন্যে ছিল। কন্যের যেমন রূপ তেমনি গুণ। রাজা বলল, তাকে আমি বে করব। শুনে কন্যে বলল, পরাণ থাকতি নয়। রাজা রাগে আগুন হয়ে সেপাই সান্ত্রীদের বললে, ধরে আন বেরাহ্মণ আর তার কন্যেকে। বেরাহ্মণ ছিল দেবী কালিকার ভক্ত। বেরাহ্মণ বলল, আমার সব্বোনাশ করলে রাজা তুমি দেবী কালিকার কোপে পড়বে। রাজা বললে, তোর দেবীকে আমি মানি না। নিজের হাতে রাজা দেবীকে নদীর গভ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙ্গে নামল বিষ্টি মুষলধারে। বিষ্টির জলে নদী ভীষণ রূপ ধারণ করল। রাজ্যপাট আর রাজা সব কিছু ভেসে গেল তাতে। দেবীর কোপে এমন হল বলেই এ নদীর নাম কোপবতী।'

'একি সত্যি কথা?' থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল মন্টু।

'সত্যি-মিথ্যে তার আমি কি জানি, বাবা। আমি মুখ্যু মানুষ। এসবই তো বলে সবাই ইদিকে। তবে আসলে এ-নদী পদ্মারই এক শাখা, সোজা গিয়ে পড়েছে সাগরে। ইদিকে যা ঝড়-বিষ্টি হয়, তেমনি বোধ হয় সারা বাংলা মুলুকের আর কোথাও হয় না। তাছাড়া সাগরের খুব কাছে ই জায়গা। আর বঙ্গোপসাগর তো ঝড়-বিষ্টির জন্যি পৃথিবীর সেরা। ঝড়-তুফানের কারণে এখানকার মানুষজনদের বড় কষ্টে থাকতে হয়। ফি বছরই ও উপদ্রব লেগে আছে বলতে পার। এ যেন দেবতার কোপ, তার জন্যি হয়ত এ-নদীর নাম কোপবতী হয়ে থাকবে।'

খাওয়া শেষ করে বুড়ো পোঁটলা বাঁধল। ওদেরও খাওয়া

ততক্ষণে শেষ হয়েছে। পোঁটলা গুছিয়ে রেখে বুড়ো বলল, 'আমরা এখন যেখান দে যাচ্ছি, নদী এখানে পেরায় এক কোশ চওড়া। আরও দক্ষিণে তিন চার কোশ চওড়া হবে। তার পরেই নদী মিশেছে সাগরে। তিন কোশ দক্ষিণে গেলে কোদালীর চর, মস্ত চর। তার বেশিটা জুড়েই জঙ্গল। অবশ্য অনেকটা তার কেটে ফেলে আবাদ হয়েছে। এখানকার সব জঙ্গলেই আগে বাঘের বড় উপদ্রব ছিল। কোদালীর চরে এখন সে ভয় নেই। তবে বাঘমারির চরের জঙ্গলে এখনও বাঘের খবর মেলে। মানুষজন সবে সেখানে গিয়ে আবাদ শুরু করেছে। এখনও মাঝে-মধ্যি জঙ্গল থেকে বাঘ বের হয়। মানুষজন ধরে নে যায়। খপর পেলে সরকারী শিকারী গিয়ে বাঘ মারে। তাই ও চরের নাম বাঘমারির চর। এরও এক কোশ দক্ষিণে হল গিয়ে তোমাদের মজিদ মিয়াঁর চর। এ তল্লাটের সব থেকে বড় চর। ও চরের জমি লোনা তাই চাষ আবাদ হয় না। তাছাড়া মিঠে পানিও নেই ও চরে। ওখানে ঝোপ-জঙ্গল মাটির গুণে তেমন বাড়তে পারেনি। মিঠে পানি নেই বলে কোনো জন্তু জানোয়ার নেই। আজকাল হাওয়া আপিস হওয়াতে মানুষজন যায় ওখানে। তবে শীতকালে ও চরে এখনও কুমীরের আড্ডা জমে। সারি সারি তারা রোদ পোহায় চরার বালিতে! আপিসের কবীর সাহেবকে তখন বন্দুক নে চলাফেরা করতে হয় সব সময়ে।'

সিধু জিজ্ঞাসা করল, 'এখন গিয়ে আমরা কুমীর দেখতে পাব?'

একটু ভেবে বুড়ো বলল, 'তা বাবা, ভাগ্যি থাকলে পাবে। কিন্তু এপথে সব থেকে দেখার বস্তু কি জান?'

'কি?' জিজ্ঞাসা করল মণ্টু।

'পীর বাবার দহ', বলল বুড়ো, 'কোদালীর চর আর বাঘমারির চর দুটো থাকার জন্যি কোপবতীর সোতে বাঁধা নেগে বাঘমারি আর মজিদ মিয়াঁর চরের মধ্যিখানে এক ভীষণ ঘূর্ণি আছে।

সবাই বলে পীর বাবার দহ। তার মধ্যি পড়লে আর রক্ষে নেই। কত লাও যে একটু ভুলের জন্যি মাঝি-মাল্লা নে তলিয়ে গেছে তার হিসাব নেই। ভয়ে কেউ ওদিক পানে যায় না। ওরই পাশ দিয়ে তোমাদের যেতে হবে, দেখো তখন।'

'সে যে ভীষণ ব্যাপার?' ভয় পেয়ে বললেন ডাক্তারবাবু, 'এ কথা তো আমি আগে জানতাম না। কবীর সাহেব তো লেখেননি।'

'না না, মিছিমিছি অত ভয় পাবেননি! পরাণ মাঝি পাকা মাঝি। এ তল্লাটে সবাই ওর ওপরে ভরসা রাখে। ও ঠিক আপনাদের পৌঁছে দেবে।'—বলল বুড়ো।

মন্টু জিজ্ঞেস করল। 'আচ্ছা চাচা, এখানকার জায়গাগুলোর এমন অদ্ভুত সব নাম কেন?'

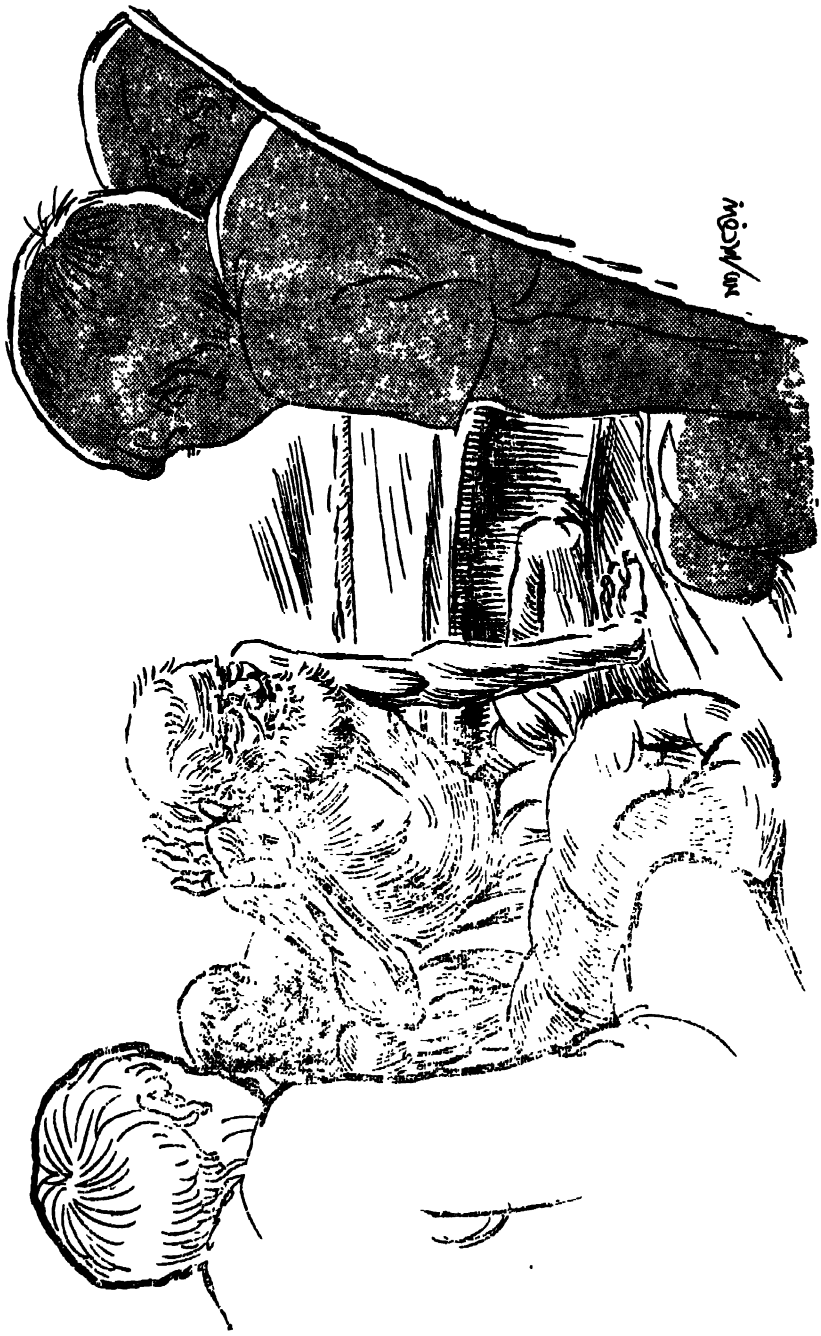
'ঝড়খালির নাম বাবা ঝড়ের থেকে।' বলল বুড়ো। 'কোদালীর অমন নাম, কারণ পেথমে ওখানকার সবাই কোদাল হাতে নে চাষ করত তাই। তাদের বলদ ছেল না বলে তারা লাঙ্গল চালাতে পারত না। বাঘমারির নাম জঙ্গলের বাঘ থেকে। যা কিনা আবাদ বসাবার সময় পেরাই মারা হত।'

সিধু জিজ্ঞাসা করল, 'আর মজিদ মিয়াঁর চরের নাম অমন হলো কেন?'

'তার একটা গল্প আছে, বাবা।' বলল বুড়ো।

'কি সে গল্প?' মন্টু আর সিধু একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

'অনেক দিন আগে ইদিকে মজিদ মিয়াঁ বলে এক জেলে ছিল।' বুড়ো তার গল্প আরম্ভ করল, 'সে তার লাও নে মাছ ধরতে আসত এই কোপবতীর জলে। তখনকার দিনে কেউ কোদালীর চরের ওধারে যেতনি ভয়ে। সবাই বলত দরিয়ার পীর বাবার মানা আছে। একদিন সারা দোপর অনেক চেষ্টা করেও পেরায় কিছুই ধরতে পারলনি মজিদ মিয়াঁ। তখন আগ করে চেঁচিয়ে আশ-



পাশের অন্য জেলেদের বললে, ও দক্ষিণে যাবে মাছ মারতে। তাতে যা হবার হোক। সবাই মানা করলে। কিন্তু ও শুনলনি। জেলেরা দেখলে অবাক হয়ে সত্যিই মজিদ মিয়াঁ তার ছোট্ট নাও বেয়ে চলেছে আরও দক্ষিণে! সবাই ভয় পেল খুব, কি জানি যদি এর জন্যি দরিয়ার পীর বাবা কুরুদ্ধ হন। সনঝে বেলাও যখন মজিদ মিয়াঁ ফিরলনি, তখন ওরা ভাবনায় পড়ল। একদল তেখুনি ফিরে যেতে চাইলে। অন্য দল বললে, মজিদ মিয়াঁর খবর না নে ফিরলে অন্যায় হবে। যারা ভীরু তারা ফিরল। সাহসী ক'জনা এগিয়ে গেল বাঘমারির চরের শেষ সীমা পেরযন্ত। সেখানে লাও বেঁধে সারা রাত তারা বাঘের হাত থেকে বাঁচবে বসে খালি কেনেস্তারা টিন বাজিয়ে জেগে রইল। কিন্তু কেউ ফিরলনি। ভোর বেলা সবাই বুঝল, মজিদ মিয়াঁ আর কোনোদিন ফিরবেনি। ওরা নাও খুলে ফিরবে বলে ঠিক করলে। শুধু একজন বেঁকে বসল। বলল, তা হবার লয়। মানুষটার সঠিক খপর না নে ফেরা অন্যায়। ঝড় নেই তুফান নেই, পাকা মাঝি, তার এ দরিয়ায় কি হতে পারে?

অন্য সবাই তাকে অনেক বোঝালে। বলল, নদীর ও দিকের খবর কারও জানা নেই। কেউ কোন দিনও যায়নি ওদিক পানে। অচেনা অজানা বার গাঙ্গে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছু লয়।

সেসব কথা সে লোকটা শুনলনি। বলল, গেলেই বড় গাঙ্গ চেনা হয়ে যাবে। আর যখন পরের উবগারের জন্য যেতেছি, তখন পীর বাবার গোসা হবেনিকো। অন্যরা তখন আরও একদিন ওখানে লাও বেঁধে অপিক্ষে করতে রাজী হলো। সকলেই তাদের জলের ভাগ থেকে কিছু কিছু করে দিয়ে সেই বোকা মাঝিটার জলের কলসী ভরে দিল। কিছু খাবারও দিলে তাকে।

লোকটা তখন বাঘমারির চরের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে লাও ভাসিয়ে দিলে। ভাবল, লাও ডুবি হয়ে যদি কোথাও চরায় উঠে থাকে

মজিদ মিয়াঁ, তার দেখা পাবে। বাঘমারির চরের কোথাও কেউ ছিল না। দু'চারটে কুমীর শুধু এদিক ওদিকে রোদ পোহাচ্ছিল। চরের শেষে এসে একটু ভাবনায় পড়ল বোকা মাঝি। এর পরের দক্ষিণের বড় গাঙের কথা আর কারও জানা নেই।

একটু ভেবে পীর বাবার নাম নে ও আবার লাও ভাসিয়ে দিল আরও দক্ষিণ পানে। একটু এগুতেই কোন দিকে আর কূলের দেখা পেলনি লোকটা, সাগর যে কতদূরে তাও জানেনিকো। ভাটির টানে জল কলকল করে ছুটে চলেছে। সে সোতেই নাও ভাসিয়ে দিল ও। মনে তখন ওর একটা শুধু আশা, যদি সামনে কোথাও লতুন চর দেখা যায়। আর যদি সে চরে দেখা মেলে মজিদ মিয়াঁর।

বেশ কিছু দূর সোতের টানে ও এগিয়ে গেছল। দাঁড়টানা নেই, কোন কাজ নেই, তাই বোধ হয় ওর দিরিষ্টি খুঁজে ফিরতেছিল নতুন চরের নিশানা। হঠাৎ খেয়াল হল, একি! লাও কেন এমন বেয়াড়া ভাবে বার দরিয়ার দিকে ছুটে যেতেছে! মনে বেজায় ভয় হল ওর! তাড়াতাড়ি লাওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে সামনে পানে তাকিয়ে, ভয়ে পরাণ আকুপাকু করে উঠল ওর! বাপ রে! সামনাপানে কিছু দূরেই এক বিরাট দহ! ঘুর্ণিটানে লাওকে টেনে নে যাচ্ছে সাক্ষেত মিত্যুর পানে! বসে পড়ে দাঁড় তুলে ও পেরানপনে বাইতে শুরু করল। মনে মনে নিজেকে বার বার বলল—ঘাবড়াস না, তাহলেই, মিত্যু।

লাও চালোনোর যত কায়দা শিখেছিল ও, মাথা ঠাণ্ডা রেখে তার সব কিছুই করল ও। পেরায় সারা দিন ঘুর্ণির সাথে লড়াই করে লাওকে যখন সিধে স্রোতের মুখে তুলল, তখন ওর দিক-বিদিক জ্ঞান লোপ পেয়েছে। সারা শরীর কেলান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে। হাত-পায়ের গুলিগুলো কাঁপতেছে থরথর করে। দাঁড় ফেলে একটু দম ফেলবে বলে যখন ও ভাবতেছে, তখনি হঠাৎ

দেখে সামনে একটু দূরে এক বিশাল চর। মজিদ মিয়াঁ যে আর কেন ফিরবে নি তা ও তক্ষণে বুঝতে পেরেছে। ঐ ভেষণ আক্ছুসে দহের গভ্যে লাও সমেত ডুবেছে মজিদ মিয়াঁ, তাতে আর ওর কোনো সন্দেহ ছেলনি। রাতটা ঐ চরার পাশে কাটিয়ে ভোরে আবার ও রওনা দেবে উত্তুরে, ভাবল। চরার যখন বেশ কাছে ও পৌঁছেচে, হঠাৎ মনে হলো বাতাসে যেন কার গলার শব্দ ভেসে এল! ঠিক যেন কেউ চেঁচাচ্ছে বলে মনে হলো ওর। নিজের কেলান্তির কথা ভুলে ও আবার দাঁড় নাবাল জলে। আঁধার ভাল করে চারদিকে ঘনিয়ে আসার আগেই, ওকে পৌঁছাতে হবে ঐ চরায়। দেখতে হবে কে চেঁচায় ওখানে। আবার পেরানপনে ও দাঁড় ফেলতে লাগল। আঁধারের বুক চিরে যখন ও পৌঁছাল চরার কাছ বরাবর, স্পষ্ট শুনতে পেল মজিদ মিয়াঁর গলা, 'ইদিক পানে এসো হে, ইদিক পানে। আমি হেথায় আছি।'

এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে দু'জনে কোলাকুলি করল খানিকক্ষণ।

মজিদ মিয়াঁ জলটল খেয়ে সুস্থ হয়ে বলল, 'বড় বাঁচা বেঁচেছি রে ভাই। দহের মুখে নাওয়ের মায়া না করে আমি জলে ঝেপিয়ে পড়েছিলাম। ইদিকে এ চরটা ছিল তাই রক্ষে।'

'সেই থেকে ও চরের নাম হয়ে গেছে মজিদ মিয়াঁর চর। তা সত্যি বলতে ও চরকে মজিদ মিয়াঁই পেরথম খুঁজে বার করেছে তো।'

বুড়ো তার গল্প বলা শেষ করল।

মণ্টু জিজ্ঞাসা করল। 'সেই বোকা মাঝি কে চাচা, যে মজিদ মিয়াঁকে উদ্ধার করল?'

বুড়ো হেসে বলল—'কে আবার? সেই ত গো পরাণ মাঝি। ঐ যে হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে! ও ছাড়া কার এমন বুকের পাটা!'

কথাবার্তায় কোথা দিয়ে যে এক ঘণ্টা সময় কেটে গেল তা ওরা বুঝতেই পারল না। হালে তখন আলিমুদ্দিন। পরাণ মাঝি খেতে গেছে ছইয়ের মধ্যে।

যে নদীর কোনো দিকে কোনো কূলই দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ সে নদীর বুকে দূরে কিসের যেন আবছায়া রেখা ফুটে উঠল! সেদিকে তাকিয়ে মণ্ট অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি, চাচা?'

'কোথায়?' চোখের ওপর হাত আড়াল করে বুড়ো দূরের দিকে তাকাল। ভাল করে কিছুক্ষণ দেখে বলল, 'ঐ তো কোদালীর চর দেখা যেতেছে।'

'এই কোদালীর চর?' অবাক সিধু জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যা, বাবা', বলল বুড়ো, 'এখন আমরা চরের ডান পাশ দে যাব। চর থাকার জন্যি কোপবতী, চরকে মাঝে রেখে দু'ধারায় বয়ে যেতেছে। এখানে পেরধান ধারা চরের বাঁ পাশ দে বয়ে গিয়ে সামনে মিশেছে। চরের ওদিকে লোকবসতি নেই। ওদিকে গভীর জঙ্গল।'

তখনি আলিমুদ্দিন হালের কাছ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'চর দেখা যেতেছে গো! চর দেখা যেতেছে।'

ওর চিৎকার শুনে ছই-এর ভিতর থেকে এক এক করে বার হয়ে এল ছটকু, বিশে আর পতিতপাবন। ওদের শেষে পরাণ মাঝি। ছই ধরে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে কি যেন ও দেখল দূরের চরের দিকে তাকিয়ে। কি যেন ভাবল ও ক' মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'লাওয়ের মুখ পশ্চিম দিকে ফেরাও হে আলিমুদ্দিন, আরও খানিকটে। সোতের টানে নইলে লাও ও গাঙ্গে চলে যাবে।'

কথা শুনে প্রাণপণে হালে মোচড় দিল আলিমুদ্দিন। ওর শরীরের সমস্ত মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠল। তাই দেখে খুশিতে

চেঁচিয়ে উঠল পরাণ মাঝি—'সাবাস মিয়াঁ, সাবাস। পরাণ মাঝি গত হলেও এ দরিয়ায় লাও ভাসবে ছিরটা কাল। এ আমি বলে রাখনু হে।'

খুশিতে আলিমুদ্দিনের মুখ লাল হয়ে উঠল। ও হেঁকে উঠল, 'দাঁড় ধর হে ছট্‌কু ভাই।'

দু'খানা দাঁড় নিয়ে নৌকোর দু'পাশে বসে গেল ছট্‌কু আর বিশে। প্রাণপণে দাঁড় বাইতে আরম্ভ করল ওরা। দূরের আবছায়া চরটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আরও কাছে আসতে দেখা গেল নদীর ধার ঘেঁষে সমস্ত চর জুড়ে ঘন জঙ্গল। কোথাও কোনো লোকের বসতি নেই!

তাই দেখে অবাক হল মণ্টু আর সিধু। ওখানে ঐ জঙ্গলের মধ্যে এতগুলো লোক নাববে কোথায়!

মণ্টু বলল, 'বুঝলি সিধু, এ নিশ্চয়ই সুন্দরবনের অংশ। বাপ্‌রে কি ভীষণ বন!'

বুড়ো ওদের কথা শুনছিল। হেসে বলল, 'এ জঙ্গলও মানুষের কাছে হার মেনেছে বাবা। চরের দক্ষিণে জঙ্গল কেটে সাফ করে মানুষ আবাদ বসিয়েছে। তোমরা যখন আমার মতো বুড়ো হবে তখন যদি ইদিকে এসো তো দেখবে এ জঙ্গলও আর নেই। কোদালীর পুরো চর জুড়ে মানুষ আর মানুষ।'

আলিমুদ্দিন চেঁচিয়ে উঠল, 'বাদাম নামাও হে পতিতপাবন! পরাণ মাঝি আর পতিতপাবন দু'জনে তক্ষুনি দড়ির বাঁধন খুলে পাল নামিয়ে দিল হড়হড় করে। পাল গুটিয়ে রেখে দু'খানা দাঁড় টেনে নিয়ে দুজনে বসে গেল দাঁড় টানতে। এক সঙ্গে তালে তালে চার খানা দাঁড় পড়তে লাগল নদীর বুকে। ঝপ্ ঝপ্—ঝপ্ ঝপ্।

বুড়ো ফিসফিস করে বলল, 'দেখো বাবা, তোমরা দেখো মানুষটাকে! এতটুকুও আহেঙ্কার নেই মনে। অত বড় মাঝি, সেও কেমন দাঁড়িদের সাথে বসে গেছে দাঁড় টানতে!'

ওরা দু'জনে তাকিয়ে দেখল সবার সঙ্গে প্রাণপণে দাঁড় টেনে চলেছে বুড়ো পরাণ মাঝি।

'ও বুড়ো হয়ে পড়েছে তা ও জানে,' বলল বুড়ো। 'তাই আলিমুদ্দিনকে হাতে কলমে পাখি পড়া শিখিয়ে যেতেছে। যাতে ওর পরেও এ লাও-এর হাল ধরতি লোক থাকে।'

চরের জঙ্গল ক্রমে পাতলা হয়ে আসতে লাগল। শেষে হঠাৎ এক জায়গায় তার শেষ হলো। সেখানে সামনে যতদূর দেখা যায় ধূ ধূ চাষের জমি। মাঝে মধ্যে এক একটা কুঁড়ে ঘর। খুব নিচু মেটে দেয়ালের ওপর খড় ছাওয়া। সব কুঁড়ের সামনেই দু-চার জন করে লোক মাঠে চাষ করছে। প্রথম বৃষ্টি পেয়ে তারা হাল বলদ নিয়ে ক্ষেতে নেমেছে।

নৌকো থেকে তখনি কেউ কেউ চেঁচাতে শুরু করে দিল।

'ও মধু ভাই, খপর সব ভাল তো?'

'ইদিকে এখন জল কেমন গো? বন্যা যেন আগে এল মনে হতেছে?'

'ও আবদুল ভাই, একবার ঘাটায় এসো। তোমার ভাই খপর পেঠিয়েছে। শুনে যাও সে।'

নদীর ঘাটায় ততক্ষণে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। কেউ এসেছে আপন জনের সঙ্গে মিলতে, কেউ যাবে বাঘমারি, কেউ বা এসেছে নতুন লোকের মুখ দেখতে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা জড়ো হয়েছে এমনি, নৌকোর লোক ওঠা-নামা দেখতেই তাদের মজা।

দাঁড়ের টানে এক সময়ে নৌকোটা হঠাৎ ঘ্যাস করে তীরের কাদায় আটকে গেল। বিশে দাঁড় রেখে লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে নৌকোর দড়ি টেনে নিয়ে ছুটল পারের দিকে। পারে পোঁতা শক্ত একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে দড়িটাকে শক্ত করে বেঁধে দিল।

ছটকু আর পতিতপাবন ততক্ষণে কাঠের তক্তাখানা নৌকোর পাশ দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে। ওদের কাজ শেষ হতেই নৌকোর সব যাত্রীরাই এক সাথে উঠে দাঁড়াল। কে যে নামবে, কে যে থাকবে তা বোঝাই গেল না।

পতিতপাবন তক্তাটার সামনে দাঁড়িয়ে হাত পাতল। বলল, 'যারা যারা ভাড়া দাওনি গো দিয়ে নাব।'

ট্যাঁক থেকে পয়সা খুলে গুণে দিয়ে নামার যারা নামতে লাগল।

পতিতপাবন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—'ও কর্তা, তোমার যে গো ছটি পয়সা কম পড়ল। দাও, দাও, দিয়ে যাও, দেরি কর না। খোল ট্যাঁক, খোল।'

'আর নেই, বাবা,' লোকটা বলল, 'সত্যি বলছি, পীর বাবার দোহাই।'

'নেই তো মরতে নাও-এ উঠেছিলে কেন? হেঁটে এলেই পারতে।' মুখ ভেংচে বলল পতিতপাবন। ওর কথা শুনে অনেকেই হেসে উঠল।

'কি করব, বাবা, গাঁয়ে ফিরবনি?' করুণভাবে বলল লোকটা।

'আর আমরা যে এতক্ষণ গতর খাটিয়ে মলাম, তার কি হবে শুনি? আমাদের পেট চলবে কিসে শুনি!'

'আল্লা দেবে, বাবা', বলল লোকটা।

'ব্যাস তবে আর কি!' বলল পতিতপাবন, 'তবে আর দাঁড়িয়ে কেন, যাও।'

সেই বুড়ো বলল, 'তোমাদের ছুটির সাথে এতক্ষণ বেশ সময়টা কেটে গেল। তা বাবা, এবারে আমি চলি। ইদিক পানে এলে, এসো না এ গরীবের কুঁড়েতে। ঘরের চিঁড়ে আর গুড়, খাওয়াব পেট ভরে। আর কোপবতীর মাছ।'

মন্টু আর সিধু উত্তরে মাথা নাড়ল। ওদের কেন যেন মনটা

বেজায় খারাপ হয়ে গেল। বেশ মানুষ এই বুড়ো চাচা। কত সরল ব্যবহার।

ওদের দু'জনের মাথায় হাত বুলিয়ে বুড়ো আস্তে আস্তে নেমে গেল। পারে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুকে বলল, 'সেলাম বাবু মশাই, আসি তাহলে।'

দূরের পথে ও চলে যেতেই সিধু বলল, 'ঐ যাঃ! ওর ঠিকানা তো নেওয়া হলো না। কি নাম জিজ্ঞাসা করা হলো না। কোদালী গেলে কি করে চিনব?'

হাল ছেড়ে দিয়ে আলিমুদ্দিনও যাত্রীদের সঙ্গে পারে নামল। পরাণ মাঝি দাঁড় তুলে রেখে, বসেছিল গিয়ে ছই-এর ওপরে। ওখান থেকেই বলল—'যাও, যাও, বাবারা, তোমরাও একটুকুন নেমে ইদিক-ওদিক ঘুরে এসো। নাও ছাড়তে এখন আধ ঘণ্টা দেরি হবে।'

সিধু বলল, 'আমরা নাবব, আর শেষে তোমরা যদি নৌকো নিয়ে চলে যাও?'

'তাই কখনি হয়?'—বলল পরাণ মাঝি, 'যাও যাও। তবে বিশেষ দেরি করবেনি কিন্তু। মজিদ মিয়াঁর চরে পৌঁছতে তাহলে বেলা পড়ে যাবে।'

পোস্ট-অফিসের পিওনও বলল, 'মাঝি ভাই, তাহলে আমিও একটু নেবে ঘুরে আসি? বসে থেকে থেকে আমার কোমর ধরে গেছে।'

'তাইতো বলতেছি গো,' বলল পরাণ মাঝি, 'যাও, হাঁটা-চলা করে কোমর ছাড়িয়ে এস গে।'

আবার নৌকো ছাড়ল। আবার বড় গাঙ্গে এসে পড়ল নৌকো। আরও ঘণ্টা দুয়েক চলে এল বাঘমারির চরে। এ চর আরও বড়, এখানে জঙ্গল আরও গভীর। নৌকোর অন্য

সব যাত্রীরাই নেমে গেল এখানে। রইল ওরা চারজন। ডাক্তার-বাবু, মণ্টু, সিধু আর পোস্ট-অফিসের পিওন।

এতক্ষণ নৌকো চালিয়ে এসেছিল আলিমুদ্দিন। বাঘমারি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকোর হাল ধরল পরাণ মাঝি নিজে। নৌকোর পালে তখন হাওয়া লেগেছে পুরো। দেখতে দেখতে বাঘমারির চর পড়ে রইল পিছনে।

ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করলেন, নৌকোর সকলেই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে পড়েছে। আলিমুদ্দিন থেকে থেকে ছই-এর ধারে উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন খুঁজছে এদিকে ওদিকে। পতিতপাবন পালের খুঁটি ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে মাঝে মাঝে। ছটকু, বিশেও নদীর স্রোতের দিকে তাকাচ্ছে বারে বারে।

এসব দেখে থাকতে না পেরে ডাক্তারবাবু পতিতপাবনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে মাঝি? অমন করে তোমরা কি দেখছ বার বার?'

'পীর বাবার দহের কাছে এসে গেইছি আমরা।' বলল পতিতপাবন, 'সে টানের মাঝে লাও পড়লে আর অক্ষে থাকবেনি।'

মণ্টু জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখে তোমরা বুঝলে দহের কাছে এসে গিয়েছ?'

'সোত দেখে, জলের টান দেখে। সে তোমরা বুঝতে পারবেনি। এখন তোমরা সবাই চুপ করে বোসো তো লাও-এর মাঝখানটিতে। উঠবেনি কিন্তু। উঠলে ঘুরে পড়ে যেতে পার।' এ কথাগুলো বলেই পতিতপাবন আবার ঝুঁকে পড়ল।

'আমরা দহটাকে দেখতে পাব?' জিজ্ঞাসা করল সিধু।

'এই একটা মজার কথা বললে, দাদাবাবু!' এক গাল হেসে বলল পতিতপাবন, 'ও দহ যে দেখবে চোখে সে আর ঘরে ফিরবেনি গো! যাও, বস গিয়ে তোমরা। আমাদের কাজ করতে দাও।'



ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পরাণ মাঝি হাঁকল, 'ওরে তোরা কমনে গেলি রে। দাঁড় ধর, দাঁড় ধর। আজ সোতের টান বড় বেশি মনে হতেছে। হাল্কা লাও টেনে নে যাবে শেষে।'

সঙ্গে সঙ্গে চারখানা দাঁড় আবার পড়ল জলে। চার দাঁড়ি প্রাণপণে টান দিতে লাগল তাতে। হালটাকেও প্রাণপণে এপাশ ওপাশ মোচড় দিয়ে দোলাতে লাগল পরাণ মাঝি। হালের দড়িতে ঘষার আওয়াজ উঠতে লাগল—সস্, সস্—সস্।

'ঐ দেখ!' হঠাৎ সিধু ফিস ফিস করে বলল মণ্টুকে। 'ঐ, ঐ দিকে।' আঙুল তুলে ও দূরে নদীর মাঝখানে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল।

সেদিকে তাকিয়ে মণ্টু প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। হঠাৎ মনে হলো ওর, সত্যিই তো, ওখানে জলের চেহারা যেন কেমন অন্য রকম। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখল, জলের স্রোত যেন কেমন অদ্ভুত ভাবে বেঁকে বয়ে চলেছে ঐ দিকেই। সে কি ডাক জলের! সে স্রোতের টানে ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে ভেসে যাচ্ছে কচুরিপানা, ভাঙ্গা কাঠ, এটা-ওটা কত কি! সব কিছুর গতিই ঐ অদ্ভুত জায়গাটার দিকে। যেন সব দিক থেকে ভেসে গিয়ে ওগুলো ওখানে জটলা পাকাবে। সব কিছুই তাই ছুটে চলেছে যেন। বাদে ওদের নৌকোখানা। সেটা যেন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে পারছে না, পরাণ মাঝির শক্ত করে ধরা হালের ভয়ে। সেই ভয়ঙ্কর বাঁকা স্রোত কেটে মহা অনিচ্ছায় একটু একটু করে সে তাই এগিয়ে চলেছে অন্য দিকে। যেদিকে পরাণ মাঝি ওকে নিয়ে যেতে চায়!

নিষেধের কথা ভুলে মণ্টু আর সিধু উঠে দাঁড়াল ছই ধরে। ঐ কি তবে সেই ঘুর্ণি! সেই পীর বাবার দহ! যার ভয়ে এদিকে নৌকো নিয়ে আসে না কেউ! ভাল করে তাকিয়েও বিশেষ কিছুই দেখতে পেল না ওরা। তবুও বুঝতে পারল, জলের

মধ্যে ওখানে একটা প্রলয় কাণ্ড চলেছে। ওদের মনে হলো, যেন সমুদ্র থেকে পথ ভুলে একটা বিরাট তিমি মাছ ওখানে আটকা পড়ে জলের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে রাগে তুমুল কাণ্ড বাধাচ্ছে।

সিধু বলল, 'বাপরে, কি ভীষণ কাণ্ড হচ্ছে ওখানে! নৌকো আমাদের ওখানে গিয়ে পড়বে না তো?'

একথার কোন উত্তরই দিল না মণ্টু। ও তখন ভাবছে, ফুলতলিতে বসে থেকে ও এই পৃথিবীর কত কিছুই না দেখতে পায় না। ফুলতলির বাইরে এমন যে একটা পৃথিবী আছে, তা কি জানে ফুলতলির আর কেউ! কেউ জানে না। ও নিজেই কি জানে, উত্তর মেরুর বরফের মুলুকে যেসব এস্কিমোরা থাকে তাদের কোনো কথা! না কি জানে, ভূটানের সম্বন্ধে কোনো কিছু! জানবে কি করে, ও তো সেসব দেশে যায় নি কোনো দিন। পীর বাবার দহের কথাও ও তেমনি জানত না। জানতে পারল এখানে এসে। হঠাৎ মনে হলো ওর—তাহলে তো বড় হয়ে ও যেখানে খুসি যেতে পারবে। এস্কিমোদের সঙ্গে ইগলুতে শুয়ে মেরুর শীত কাটাতে পারবে। তা হলেই তো ও জানতে পারবে ওদের সম্বন্ধে সব কথা···

নদীর বুকে নৌকোর পাটাতনের ওপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন ওর সামনে সমস্ত পৃথিবীর বন্ধ দরজা খুলে গেল। কে যেন ওকে বলল, 'যাও, এবারে এগিয়ে যাও। আর কোনো বাধা নেই। শুধু চোখ খুলে দেখ। তাহলেই জানতে পারবে অনেক কিছু!'

'সাবাস ভাই সব!'—চেঁচিয়ে উঠল পরাণ মাঝি. 'আর খানিকটে জোরে। ব্যাস্।'

তাকিয়ে দেখল মণ্টু, 'দাতে দাঁত চেপে প্রাণপণে দাঁড় টানছে চারজন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু নাক দিয়ে ঝড়ের মত ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস পড়ছে ওদের। সব কিছু ভুলে,

মরণপণে দাঁড় টানছে আর দরদর করে ঘাম বইছে ওদের দেহ দিয়ে। ভিজে গেছে পরনের কাপড়, কোমরের গামছা, এমন কি মাথার চুল। চুলের ডগা বেয়ে টপ্ টপ্ করে ঘাম পড়ছে।

'সাবাস রে ভাই, সাবাস! মরদ বটে তোরা!' আবার চেঁচিয়ে উঠল পরাণ মাঝি। ওরও সমস্ত মন পড়ে রয়েছে নৌকোর হালের ওপর। সারা দেহের পেশী ফুলিয়ে সে হালের টানে নদীর ভয়ঙ্কর স্রোত কাটিয়ে নৌকোকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কোথায় তীর সেখানেই নিয়ে যাবে নৌকো। তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই নেই ওর মনে।

দূর থেকে দূরে, আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল দরিয়ার পীর বাবার অভিশাপ! সেই বুড়ো মুসলমানটি এক সময় কথায় কথায় বলেছিল—'তোমরা যারা এ দরিয়ার নিয়ম-কানুন মানবে, না, তাদের শাস্তি দেবেন পীর বাবা। ভীষণ কঠিন শাস্তি। ক্ষমা তিনি করেছিলেন মাত্র দু'জনকে। এক, যে সাহসে ভর করে এসেছিল অচেনা নদীর রহস্য খুঁজতে, তাকে। আর যে নিজের প্রাণের মায়া না করে এসেছিল হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর খোঁজে, তাকে। পীর বাবা পাপীকে শাস্তি দেন, অন্যকে নয়!'

ক্রমে নদীর টান স্বাভাবিক হয়ে এল। তবুও কিন্তু দাঁড় টানা বন্ধ করল না মাঝিরা। পরাণ মাঝির হুকুম তখনো মেলেনি তাদের।

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকেও যখন জলের ঘূর্ণির দিক আর ঠিক করতে পারল না মণ্টু, তখন ও বসে পড়ল। বলল, 'বাবা, তুমি দেখলে না তো কি ভয়ঙ্কর!'

সিধুও বসে পড়েছিল। তখনো কেমন যেন ঘোর কাটেনি ওর। ও বলল, 'বাপ্ রে কি ভীষণ সুন্দর!' এতক্ষণ পরে খেয়াল হলো ওদের দু'জনের, উত্তেজনায় ওদের-ও সমস্ত গা ঘামে ভিজে গেছে।

'আজকের দিনের কথা চিরকাল মনে থাকবে', বললেন ডাক্তার-বাবু। 'তোমরা দেখেছ, ওতেই আমার দেখা হয়েছে।'

'আসছে ছুটিতে আবার আমরা আসব এদিকে বেড়াতে।' বলল মণ্টু।

পরাণ মাঝি তখনি হুকুম করল—'ওরে তোরা দাঁড় টানা বন্ধ কর। একটু জিরেন দে।'

মাঝিরা সবাই দাঁড় তুলে ফেলে এক সাথে চেঁচিয়ে উঠল—'জয় দরিয়ার পীর বাবা, আমাদের কথা ভুলোনি গো বাবা।'

তারপর ওরা সটান শুয়ে পড়ল নৌকোর পাটাতনের ওপর। এতক্ষণ ওদের আর কোনো কিছুতেই খেয়াল ছিল না।

শুয়ে শুয়েই আলিমুদ্দিন বলল, 'দখিনের আকাশে যে আবার বাদল ঘনিয়ে এসেছে গো বড়মাঝি। আজ কপালে দুঃখু আছে নেম হতেছে।'

উত্তরে পরাণ মাঝি বলল, 'হাওয়া ছাড়েনি এখনো, এই যা সব্বোরক্ষে। আর তো এসে গেইচি। একটু জিরেন দিয়ে ফের দাঁড় ধর তোরা। এক টানে পৌঁছে যাব তুফানের আগে।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল মণ্টু। আবার যদি বৃষ্টি পড়ে নদীর মাঝখানে তাহলে কি হবে।

সিধুও বোধ হয় ভয় পেয়েছিল! বলল, 'বেলা পড়ে এসেছে রে মণ্টু আর কতক্ষণ লাগবে আমাদের পৌঁছাতে?'

নিজের মনের কথা গোপন করে মণ্টু বলল, 'তুই ভয় পেয়েছিস সিধু! সত্যি বল?'

'দূর, কে বলল!' হাসতে চেষ্টা করে সিধু বলল। 'তবে আকাশে মেঘ দেখে ভাল লাগছে না।'

'শুনলি না পরাণ মাঝি বলল, ঝড়ের আগেই পৌঁছে যাব আমরা', বলল মণ্টু।

'তাই যেন হয়', উত্তর দিল সিধু।

'ভীতু কোথাকার!' হেসে বলল মণ্টু। মনে মনে তখন কিন্তু ও ভগবানকে ডাকছে, যেন বৃষ্টি নামার আগেই ওরা পৌঁছাতে পারে। যে নদীর একূল ওকূল দেখা যায় না, তার বুকে ছোট্ট একটা নৌকো চড়ে যেতে ভয় হয় বইকি!

দেখতে দেখতে চারদিক ঘিরে অন্ধকার নেমে এল। মনে হলো যেন সূয্যি মামা হঠাৎ রাস্তা ভুল করে অন্য পথে তাড়াতাড়িই অস্ত গেল। নদীর জলের স্রোতও যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল ভীষণ। আকাশের মেঘগুলোও যেন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চটপট সারা আকাশ দখল করে নিল!

মাঝিরা উঠে ছই-এর ভিতর গিয়েছিল। সেখানে কে যেন একটা লণ্ঠন জ্বেলে দিল। সে আলোয় শুধু নৌকোর পাটাতন-টুকুই দেখা যেতে লাগল, বাইরের বাদ বাকি সব কিছু অন্ধকারে লেপা-পোঁছা।

এত অন্ধকারে পথ ঠিক রাখবে কি করে পরাণ মাঝি, এ চিন্তা হলো সিধুর। কিন্তু অন্ধকারের মাঝে হাল ধরে দাঁড়ান পরাণ মাঝির আবছা চেহারা দেখে মনে হলো না যে এর জন্য তার এতটুকুও ভাবনা হয়েছে।

অন্য মাঝিরাও এ নিয়ে কোনো চিন্তা করছে না। নৌকোর ছইয়ের মধ্যে বসে ওরা তখন কি নিয়ে যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলে হাসাহাসি করছে। সিধুর মনে হলো এখন কোনো মতে পৌঁছাতে পারলে হয়। ফুলতলির শেখ সদর আলি সাহেবের বারণ না শুনে এমন করে আসা বোধ হয় ঠিক হয়নি ওদের। কে জানত এমন অন্ধকারে দিকহারা হয়ে নৌকোয় বসে থাকতে হবে! সামনে সমুদ্র, সে দিকে যদি ভেসে যায় নৌকো! তাহলে!!

সিধু চুপি চুপি বলল, 'আমি তো কোন দিকেই কিছু দেখতে পাচ্ছি না মণ্টু, দিক ভুল করেনি তো মাঝি?'

চাপা ধমকে মণ্টু বলল, 'চুপ কর, ও কথা ভেবে এখন লাভ ?'

তখনি ফের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করে দিল। পালের কাপড়টা সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন খোলা ছেঁড়া কাপড়ের মত এদিক ওদিক উড়তে লাগল।

হেঁকে উঠল পরাণ মাঝি—'ওরে আবার তোরা দাঁড় ধর শিগগির। দেখছিস না বাতাস ছেড়েছে।'

চারখানা দাঁড় আবার পড়ল জলে এক সাথে। নৌকোটাও যেন কেমন এলোমেলো বেতালে দুলতে শুরু করে দিল। সে শুধু কিছুক্ষণের জন্য। তারপরেই আবার পালে বাতাস লাগল। দুলুনি ছেড়ে আবার নৌকো সোজা চলতে লাগল।

ঠাণ্ডা বাতাসে তখন কাঁপুনি লেগে গেছে মণ্টু আর সিধুর। বৃষ্টি এল বুঝি! যা ভয় করেছিল সিধু তাই হলো তবে! আর কিছুই ভাবতে পারল না সিধু। ইশারায় মণ্টুকে ডেকে নিয়ে সরে গিয়ে ছইয়ের মধ্যে বসল। সেখানে দেখল পোস্ট-অফিসের পিওন একপাশে টানটান হয়ে শুয়ে রয়েছে। ওদের দেখে কান্না ভরা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আর কত দূর দাদা বাবু? আমার শরীর ভীষণ খারাপ করছে।'

'এই তো এসে গেছি,' মনের ভয় কোন মতে চেপে বলল মণ্টু, 'আর বেশি দেরি নেই।'

'এমন জানলে আমি আসতাম না।' বলল পিওন, 'এ যে প্রাণ হাতে করে আসা!'

'না না, তত ভয়ের কিছু নেই।' সাহস দিয়ে বলল সিধু।

'আমি যে একদম সাঁতার জানি না।' হতাশ পিওন বলল।

'তাতে কি হয়েছে!' বলল মণ্টু, 'আমরা ঠিক পৌছে যাব।'

মনে মনে ভাবল মণ্টু, এ নদীতে সাঁতার জানলেই বা কি! সাঁতরে কি এ সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যায়? কোন দিকে যে পার তাই তো জানে না কেউ। এখানে নৌকোডুবি হলে বাঁচার

আশা নেই। নদীর জলে হাঙ্গরের কথাও তো শুনেছে ওরা!

চুপ করে বসে রইল ওরা সবাই। কত সময় যে আর লাগবে তা কে জানে! ছইয়ের মধ্যে আলো জ্বলছে, কিন্তু বাইরে ঘন কাল অন্ধকার জমাট বাঁধা। আকাশ ভর্তি মেঘ। হু হু করে হাওয়া বইছে, নৌকো চলেছে সে হাওয়ার ধাক্কায়।

কতক্ষণ যে চুপ করে ওরা বসেছিল সে খেয়াল নেই। হঠাৎ বাইরে মাঝিদের কথায় চমক ভাঙ্গল সকলের। সবাই খেয়াল করল দাঁড় টানার শব্দ বন্ধ হয়েছে। নৌকোর দুলুনিও যেন অনেক কম। তবে কি এসে গিয়েছে ওরা?

'চল বাইরে যাই।' বলল মণ্টু।

সিধুও যেন তার জন্যই তৈরি হয়ে ছিল। এক সঙ্গেই দু'জনে ওরা ছইয়ের বাইরে বার হয়ে এল। নৌকোর সামনের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল ওরা।

মণ্টু বলল, 'ওটা কি দেখা যাচ্ছে রে!'

দূরে অন্ধকারের বুকে জমাট বাঁধা একটা অন্ধকারের পাচিল যেন দাঁড়িয়ে আছে নদীর বুকে।

'ওটা কি রে?' জিজ্ঞাসা করল সিধু।

'ঐ বোধহয় মজিদ মিয়াঁর চর', বলল মণ্টু।

অন্ধকারের ভিতর এতক্ষণ ডাক্তারবাবু একলা চুপ করে বসেছিলেন। কি যেন ভাবছিলেন উনি আপন মনে। রোগ ও রুগী এই নিয়েই জীবন কেটেছে ওঁর। লোকের দুঃখের তাড়ায় অন্য কোনো দিকে এত দিন উনি নজর দিতে পারেন নি। আজ একলা এই গভীর অন্ধকারে ঘনিয়ে আসা ঝড়ের ভয় সামনে নিয়ে, সব কিছু যেন কেমন ভয়ঙ্কর সুন্দর বলে মনে হচ্ছিল ওঁর।

উনি বললেন, 'আমারও মনে হচ্ছে, ওটাই মজিদ মিয়াঁর চর। ওখানেই বোধহয় আমাদের নামতে হবে!'

'ঐ ভয়ানক অন্ধকারে!' অবাক সিধু জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে

কোথায় নামব আমরা ?'

'কি জানি', একটু ভাবনার পরে বললেন ডাক্তারবাবু। 'অন্ধকারে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, ওটা দ্বীপ না অন্য কিছু।'

হালের কাছ থেকে পরাণ মাঝির গলা ভেসে এল—'কি দেখতেছো গো খোকাবাবুরা ? ঐ তো মজিদ মিয়াঁর চর। আমরা এসে গেইচি। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা লাগবে।'

'ওটা দ্বীপ তো. অমন ভীষণ দেখাচ্ছে কেন ?' বলল মণ্টু।

'আঁধারে দূরের জিনিস অমনই দেখায় গো,' বলল পরাণ মাঝি। 'ওখানে তো জনমনিষ্যি নেই যে কেউ আলো জ্বালবে। তাছাড়া সারা চর জুড়ে খালি ঝোপ-জঙ্গল। তাই অমন মনে হতেছে।'

পরাণ মাঝির কথা শুনে ভয় কাটল ওদের। আনন্দে মণ্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'ও পিওন ভাই, আমরা এসে গিয়েছি। আর শুয়ে থেকো না। এসো, বাইরে এসো।'

ওর কথা শেষ হতেই হুড়মুড় করে ছইয়ের ভিতর থেকে পিওন বার হয়ে এল। 'কইগো বাবু কোথায় ? কোথায় নামতে হবে ?' মহা উৎসাহে জিজ্ঞাসা করল ও।

'ঐ যে দেখ সামনে চর।' হাত তুলে অন্ধকারের মধ্যে দেখাল মণ্টু। 'নামার এখনও দেরি আছে।'

হঠাৎ পরাণ মাঝি চেঁচিয়ে উঠল,—'ওরে পতিত, ঐ দেখ ওদিক-পানে। কি দেখতেছিস ?'

বুকের মধ্যে আনন্দে যেন কেমন করে উঠল মণ্টুর ! আলো ! আলো !

অনেক দূরে কোথায় যেন একটা আলো টিম টিম করে জ্বলছে। এত গভীর অন্ধকারের বুকে আলোটাকে যেন ওদের একটা নক্ষত্রের মত মনে হলো। তবুও ওটা আলো। এমন সুন্দর আলো কি ওরা এখানে দেখবে বলে ভেবেছিল ?

আলো, আলো, আলো !!

পাড়ে নৌকো ভিড়ল শেষ পর্যন্ত। অন্ধকারের বুকে কে যেন একটা হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বেলে বেঁধে দিয়েছে একটা খুঁটির মাথায়। তারি আলোয় ঘাটের আশপাশটায় কিছু আলো হয়েছে। সেই আলোতেই দেখল ওরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন মানুষ।

তক্তা নামাল পতিতপাবন। বলল, 'যাও, নাবো গো, দাদা-বাবুরা, ঐ তো ঘাটে দেঁইড়ে আছে কবীর সাহেব আর আরসাদ ভাই।'

'বাবা, তুমি এসো। আমরা নামছি।' বলেই মণ্টু তক্তা বেয়ে নামতে শুরু করল। ওর পেছন পেছন সিধু।

ডাক্তারবাবু বললেন—'আরে তোমরা দাঁড়াও, আমিও আসছি।'

ওদের সবাইকে সামনে দেখে অবাক কবীর সাহেব। ডাক্তার-বাবুকে বললেন—'আজ আপনারা আসবেন তা ভাবিনি। আজ তো নৌকো ছিল না। যাক, এসেছেন দেখে খুব খুশি হলাম। আমরা দুটো মানুষ পড়ে আছি এই নির্জন দ্বীপে।'

ডাক্তারবাবু বললেন—'পরাণ মাঝির জন্যই আজ আসা সম্ভব হলো। নইলে ঝড়খালিতে বসে থাকতে হতো। আপনি তো নৌকো ছাড়ার দিন সম্বন্ধে চিঠিতে কিছু লেখেননি।'

'তাইতো বড় ভুল হয়ে গেছে!'—বললেন কবীর সাহেব, 'পরাণ মাঝিকে ভাল করে বকশিস দিতে হবে।'

কবীর সাহেবের আর্দালি আরসাদ নৌকো থেকে মালগুলো নামিয়ে আনল। বলল, 'বৃষ্টি আসছে ভীষণ। চলুন, ঘরে চলুন সবাই।'

ব্যস্ত হয়ে কবীর সাহেব বললেন, 'চলুন চলুন, ঘরে গিয়ে কথা হবে খনে।'

কথা বলতে বলতে সবাই এগোল হাওয়া অফিসের দিকে। ঠাণ্ডা বাতাস তখন বেশ জোরেই বইতে শুরু করেছে। তাই দেখে কবীর সাহেব আরসাদকে বললেন, 'মাঝিদের বল, নৌকো ভাল করে বেঁধে রেখে ওরা যেন অফিস ঘরের বারান্দায় এসে থাকে। নইলে রাত্রে ঝড়-বৃষ্টি হলে বড় কষ্ট পাবে।'

আরসাদ বলল, 'আমি বলে দিচ্ছি সাহেব।'

'ওদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাও করো কিন্তু!' বললেন কবীর সাহেব।

তারপর হাতে হ্যাজাক লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে বললেন—'আসুন আপনারা, আমার সঙ্গে। আমরা এগোই। আরসাদ ওদের নিয়ে পরে আসবে।'

নরম ভিজে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মণ্টুর মনে হলো, যেন কত দিন পরে ও আবার হাঁটছে মাটির ওপর দিয়ে, যেন এক যুগ পরে।

পথ চলতে চলতে মণ্টু আর সিধুর সব খবর জেনে নিলেন কবীর সাহেব। বললেন, 'এলে তো ভাই এখানে বেড়াতে। দু'দিনেই না হাঁপিয়ে ওঠ। চারদিকে জল আর জল। তার মাঝে এই রুক্ষ বেলে মাটির দেশ। বেশীদিন কি তোমাদের ভাল লাগবে এখানে?'

'খুব ভাল লাগবে।' বলল সিধু, 'সারাদিন নৌকোয় আসার কথাই তো আমরা কোনদিন ভুলব না।'

'এখানে কুমীর দেখতে পাব?' মণ্টু জিজ্ঞাসা করল, 'পারের চড়ায় নাকি এখানে কুমীর উঠে রোদ পোহায়!'

'সে চড়া এদিকে নয়।' বললেন কবীর সাহেব, 'চড়ার ওপাশে কুমীরদের আড্ডা আছে। সেখানে যাওয়া হবে না তোমাদের। সে বড় ভয়ানক জায়গা। এদিকে মানুষ আসার পর আর কুমীর আসে না।'

নৌকোঘাটা থেকে হাওয়া অফিস কাছেই। মাঝখানে একটা আগাছার ঝোপ-জঙ্গল। তার পরেই হাওয়া অফিসের পাকাবাড়ি। ঝোড়ো হাওয়ার বেগ বাড়ার আগেই কথা বলতে বলতে ওরা সবাই তার কাছে গিয়ে পৌঁছাল। কিন্তু আর ক'পা এগোতেই চারদিক ছেয়ে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। একছুটে ওরা সবাই উঠল এসে বাড়িটার বারান্দায়।

বাড়িটার একদিকে থাকার কোয়ার্টার অন্যদিকে হাওয়া অফিস। লম্বা টানা একটা ঢাকা বারান্দা দিয়ে তুটো যোগ করা।

কবীর সাহেব বললেন, 'এবারে দেখছি কালবোশেখির সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বর্ষা দেখছি আগেই এসে গেল। এখানে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে আর ঘর থেকে বার হবার উপায় থাকে না। তোমরা এলে ভাই, দেখ তোমাদের না আঁধার ঘরেই বসে থাকতে হয়। যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে কাল থেকে!'

সিধু বলল, 'চাচা, আমাদের সঙ্গে আপনার জন্য সরকারি চিঠি নিয়ে একজন পিওনও এসেছে ঝড়খালি থেকে। সে কিন্তু নাবেনি নৌকো থেকে।'

'সে কি, আগে বললে না!' ব্যস্ত হয়ে বললেন কবীর সাহেব। 'ওকেও তাহলে আমাদের সঙ্গেই এখানে নিয়ে আসতাম, কিন্তু কি চিঠি যে এল সদর থেকে কে জানে।' বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন কবীর সাহেব। চিন্তায় পড়লেন উনি।

বারান্দা পার হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা টেবিল ঘিরে বসল ওরা সকলে। সেখানেই কথাবার্তা হতে লাগল।

বৃষ্টি একটু কমতেই পিওনকে নিয়ে আরসাদ ফিরল। বলল, 'সাহেব, মাঝিরা কেউ নৌকো ছেড়ে আসতে চাইল না। তাই শুধু পিওন ভাইকেই নিয়ে এসেছি আমি।'

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ওরা আবার টেবিল ঘিরে বসল। কত কথা যে কবীর সাহেবের জানার আছে, তা নিয়েই

উনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। ডাক্তারবাবু তাঁর সব কথার উত্তর দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মণ্টু আর সিধুর হাই উঠতে লাগল। তাই দেখে সেদিনের মতো কথাবার্তা ওখানেই শেষ হলো।

আরসাদ ততক্ষণে বিছানা করে রেখেছিল। ওরা গিয়ে শুয়ে পড়ল। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কাঁচের জানলায় জলের ঝাপটা লেগে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

কবীর সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা বারান্দা পার হয়ে গিয়ে ঢুকলেন হাওয়া অফিসের যন্ত্রপাতির ঘরে। মন দিয়ে তিনি যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

পিওন খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বারান্দার এক পাশে এসে শুয়ে পড়ল। তাকে দেখেই সরকারি চিঠির কথা মনে পড়ল ওঁর। পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে পড়লেন উনি। চিঠি পড়ে মন ওঁর খুশিতে ভরে গেল। যাক, এতদিন বাদে সরকারের ওঁর প্রতি নজর পড়েছে। খবর এসেছে—আরও ছ-জন লোক আসছেন ওঁকে সাহায্য করবার জন্য। আরও একজন বেয়ারা আসবে তাদের সঙ্গে। একা আর রাত-দিন এইসব যন্ত্রপাতিগুলো ওঁকে আগলাতে হবে না!

যন্ত্রপাতি পরীক্ষার কাজ শেষ করে উনিও গিয়ে শুয়ে পড়লেন। বাইরে তখনও সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। তবে এ বৃষ্টি আর বেশিক্ষণ হবে না যে সে খবরও উনি পেয়েছেন আবহাওয়া মাপার যন্ত্রগুলো থেকে। খুশি হয়ে উনি চোখ বুজলেন।

হাওয়া অফিসের যন্ত্রপাতি দেখে আর সমুদ্রের তীরে বেড়িয়ে দু'দিন দিব্যি কেটে গেল মণ্টু আর সিধুর।

আজ সোমবার। সপ্তাহের আবহাওয়ার রিপোর্ট সদরে যাওয়ার

দিন। সকাল থেকেই তাই কবীর সাহেবের অনেক কাজ। ডাক্তারবাবু নিজেই তাই সেদিন সকালবেলা মণ্টু আর সিধুকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বার হয়ে পড়লেন। সমুদ্রের তীরে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে, গেলেন নৌকোঘাটায়। সেখান থেকে সোজাসুজি চরার মাঝখানটা পাড়ি দিয়ে গেলেন সেই ভয়ঙ্কর ঝোপ-জঙ্গলের কাছ বরাবর। যদি কোথাও দূরে কুমীর দেখা যায় তারই আশায়। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। মণ্টু আর সিধু আরও এদিক ওদিক খুঁজতে চাইছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবু রাজী হলেন না।

এখানে আসার দিনের বৃষ্টির পর থেকেই রোজ রোজ গরম বাড়তে বাড়তে তা আজ যেন সবার অসহ্য বলে মনে হতে লাগল! এর মানে আবার একদিন ঝড়-বৃষ্টি হবে। হওয়াই উচিত। এ গরম ভাবণ ভয়ঙ্কর। রোদে টো-টো করে ঘোরা বন্ধ করে ওদের দু'জনকে নিয়েই হাওয়া অফিসে ফিরলেন উনি। তখন বেশ বেলা হয়েছে। এসেই দেখলেন মুখ গম্ভীর করে কবীর সাহেব ঘন ঘন তাঁর যন্ত্রপাতিগুলো সব পরীক্ষা করছেন। ওদের দেখে বললেন, 'চলুন, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া যাক। আজ আবহাওয়া ভাল থাকবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

ওঁর কথা শুনে হাসিই পেল সিধু আর মণ্টুর। সারা আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। যতদূর নজর যায় কোথাও একটুকরো ছেঁড়া মেঘ নেই। হাওয়াও জোরে বইছে না। আর আজই কিনা আবহাওয়া ভাল থাকবে না!

কোনো মতে খাওয়া শেষ করেই, কবীর সাহেব আবার গিয়ে যন্ত্রঘরে ঢুকলেন। ঘন ঘন যন্ত্রগুলো পরীক্ষা করে কেমন যেন ছটফট করতে লাগলেন। শেষে সময়মতো রেডিও যন্ত্র চালিয়ে দিয়ে আশেপাশের অন্য সব হাওয়া অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। নিজের যন্ত্রের নির্দেশগুলো তাদের জানিয়ে অপরদের

খবর কাগজে লিখে নিলেন। মুখ ওঁর আরও গম্ভীর হয়ে গেল। তাই দেখে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনোদিকে ঝড়ের খবর পেলেন নাকি ?'

'এখনো পাইনি।' বললেন উনি, 'তবে কি জানেন, আশপাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে হঠাৎ বাতাসের চাপ খুব কমে যাচ্ছে। এমন এখানে সাধারণত হয় না, হয় সমুদ্রের মাঝখানে। লক্ষণ ভাল নয়।'

'তবে কি ঝড় আসছে ?' বলল মণ্টু।

'না, তা এখনো বলা যায় না। হয়তো এ অবস্থা অল্পে অল্পে আপনা থেকে ঠিক হয়ে যাবে।' বললেন কবীর সাহেব, 'যা গরম পড়েছে কদিন !'

খবরটা শুনে কিন্তু মণ্টুর মজাই লাগল। হাওয়া অফিসের পাকা বাড়িতে আছে ওরা। ঝড়ে এ বাড়ির কিছুই করতে পারবে না। তবে ঝড় এলে মন্দ কি ? বেশ নতুন একটা কিছু দেখা হয় ওদের। কথাটা ও চুপি চুপি সিধুকে বলল। সিধুরও তাই মত।

কবীর সাহেব কিন্তু যন্ত্রঘর ছেড়ে বাইরে এলেন না। যন্ত্রগুলো থেকে থেকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। আর রেডিওতে অন্য সব হাওয়া অফিসের সঙ্গে তাই নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। তা দেখে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঝড় কি আসছে নাকি তাহলে ?'

'সে রকমই তো মনে হচ্ছে।' উত্তর দিলেন কবীর সাহেব।

'কিন্তু আকাশ তো বেশ পরিষ্কার !' বলল সিধু, 'মেঘ নেই, হাওয়া নেই, ঝড় হবে কি করে ?'

'ব্যারোমিটারের চাপ হু হু করে কমে যাচ্ছে !' বললেন কবীর সাহেব, 'এটাই ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। আবার হঠাৎ যখন

ব্যারোমিটারের চাপ বাড়তে থাকবে তখনি চারদিক থেকে প্রচণ্ড বেগে বাতাস ছুটে আসবে। সঙ্গে নিয়ে আসবে মেঘ বৃষ্টি আর ঝড়। যাকে এখানকার লোকেরা বলে তুফান।'

বিকেল চারটে নাগাদ কবীর সাহেব রেডিওতে খবর পেলেন, বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার দূরের এক জায়গায় প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে গেছে। যত দূর বোঝা যাচ্ছে সে ঝড় ওড়িষ্যার উপকূল দিয়ে বয়ে যাবে। এ খবর দিল ওড়িষ্যা হাওয়া অফিস। তারা বলল, শেষ সঠিক খবর তারা সময়মতো জানিয়ে দেবে। রেডিও যোগাযোগ রাখতে বলল ওড়িষ্যার হাওয়া অফিস।

কবীর সাহেব এ খবর তখুনি জানিয়ে দিলেন কলকাতাকে। তাঁর যন্ত্রপাতি কি বলছে তাও জানালেন। ঝড় ওড়িষ্যার উপকূল দিয়ে না গিয়ে এদিকেও যে আসতে পারে, তাঁর এই ধারণার কথাও জানাতে তিনি ভুললেন না। ঝড়ের গতিপথের কথা ওড়িষ্যার হাওয়া অফিস জানালেই তিনি তখুনি কলকাতাকে জানাবেন বললেন।

তারপর রেডিওর সামনে বসে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। সিধু আর মণ্টু দেখল বাইরের রোদের তেজ হঠাৎ যেন কমে গিয়েছে, সারা আকাশ জুড়ে ঘষা কাঁচের মত পাতলা মেঘে চারদিক ছেয়ে গিয়েছে। তার মাঝ দিয়ে সূর্যকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঝকঝকে পরিষ্কার দিনটা হঠাৎ যেন কেমন ঘোলাটে আলোয় ভরে গেছে। ঝড় কি তবে এসে গেল? কিন্তু কই, হাওয়া তো এখনও জোরে বইছে না! সারা আকাশ জুড়ে ঘন কাল মেঘ তো ছেয়ে যায়নি।

আরসাদ বিকেলের চা জলখাবার হাওয়া অফিসেই দিয়ে গেল। ওখানে বসেই ওরা সবাই চা খেতে লাগল। অন্য দিন এ সময়ে অনেক কথা বলেন কবীর সাহেব। আজ ওঁর মুখে

কথা নেই। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এ যন্ত্র ও যন্ত্র দেখে বেড়াচ্ছেন উনি। এক সময়ে আপন মনেই বললেন, 'ওড়িষ্যার অফিস এত দেরি করছে কেন খবর দিতে? অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না।'

চা খাওয়া শেষ করে তিনি সিধু আর মন্টুকে বললেন, 'আজ তোমরা আর বাইরে বেশিক্ষণ থাকবে না। বার হয়ে পড়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্রের তীর অবধি গিয়ে আকাশের অবস্থা দেখে এসে আমাকে বলবে। আমি তোমাদের খবরের জন্য অপেক্ষা করব।'

কবীর সাহেব কেন যে ওদের একাজে পাঠাচ্ছেন তা ওরা বুঝতে পারল না। তবুও খুশি মনেই বাইরে যাবে বলে উঠে পড়ল।

কবীর সাহেব আবারও বললেন, 'মনে রেখো, তোমাদের দেখার উপর কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করছে, যাও দেরি কর না।'

কিছু না বুঝলেও কবীর সাহেবের কথামতো কাজ করবে বলেই ওরা বার হয়ে পড়ল। মনে মনে কবীর সাহেব যে বেশ চিন্তায় পড়েছেন তা ওরা বুঝতে পেরেছিল। তার মানে এ ঝড় হয়তো ভীষণ জোরেই আসছে। আজ কিন্তু আকাশ তত খারাপ নয়। এর থেকেও ঘন কাল মেঘে ভরা ছিল আকাশ গত কদিন।—কিন্তু ব্যারোমিটারের চাপ গত কদিন এত কমেনি।

হাওয়া অফিস থেকে বার হয়েই ওরা বুঝল, বাইরে যেন আগুনের হল্কা বইছে। একটু এগোতেই ওরা ঘেমে উঠল। বাতাসের গতি অন্য দিনের থেকে কেমন যেন এলোমেলো। তাড়াতাড়ি ওরা গিয়ে দাঁড়াল সমুদ্রের ধারে। তখন যদিও ভাঁটা তবুও জলের ঢেউগুলো অন্য দিনের চাইতে অনেক বড়। আর ঢেউগুলো ঘন ঘন এসে আছড়ে পড়ছে তীরে। আজ যেন এ দ্বীপের

সব কিছু কেমন অন্য রকমের মনে হলো ওদের। বোধ হয় আকাশের ঘষা কাঁচের মতো মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো পড়ে সব কিছু এমন অন্য রকম দেখাচ্ছে।

'আকাশটা ভাল করে দেখ।' বলল সিধু, 'মেঘ নেই ভেবেছিলাম কিন্তু এখন তো দেখছি তা ঠিক নয়।'

মণ্টু তাকিয়ে দেখল, দক্ষিণে আকাশ যেখানে সমুদ্রে মিশেছে, সেখানে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে ঘষা কাঁচের মতো জমাট মেঘ ভারি অদ্ভুত আকার নিয়ে জমা হয়েছে, অনেকটা জায়গা জুড়ে।

'এমন মেঘ কখনো দেখিনি।' বলল সিধু।

'আজ এ চরার সব কিছুই অদ্ভুত লাগছে।' বলল মণ্টু।

'আমাদের সব কিছু ভাল করে দেখে যেতে বলেছেন চাচা।' বলল সিধু।

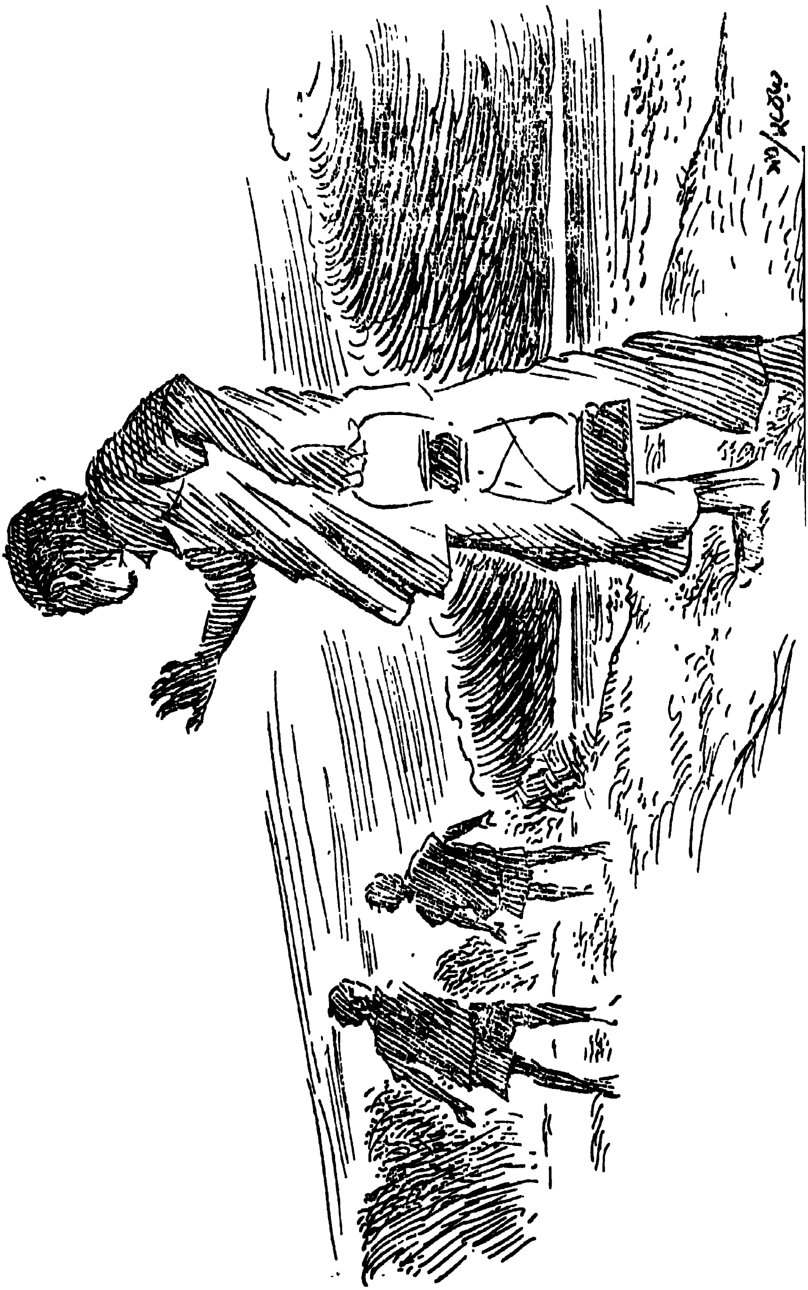
'তবে দাঁড়া, আমরা সূর্যাস্ত দেখেই ফিরব।' বলল মণ্টু, 'তার তো আর বেশি দেরি নেই।'

'ঐ মেঘগুলোর জন্য সূর্যাস্ত কি দেখা যাবে?' জিজ্ঞাসা করল সিধু।

'কি জানি, দেখেই যা না! হয়তো নতুন কিছু দেখব।' বলল মণ্টু।

ওরা দাঁড়িয়েই রইল। আকাশ লাল করে সূর্য অস্ত গেল। কিন্তু এ যেন অন্য দিনের মতো অত লাল নয়। ঘষা কাঁচের মতো মেঘের জন্যই যে অমন হলো তাতে সন্দেহ নেই। শেষে দিগ্‌বলয়ের কাছের মেঘে সূর্য কিছুক্ষণ লুকোচুরি খেলে, মেঘের মধ্যেই হারিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ধোঁয়াটে লাল আভায় চারদিক ভরে গেল। এর কিছু পরেই যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে চারদিক ঘিরে, তা ওরা বুঝতে পারল।

'চল এখন যাই।' বলল সিধু, 'আর দেরি করলে, চাচা ভাববেন।'



'চাচা মিছিমিছি ভয় পেয়েছেন।' বলল মণ্টু, 'ঝড় হবে না, দেখিস।'

ওরা যখন অর্ধেক রাস্তা ফিরে এসেছে, দেখল একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আরসাদ চলেছে নৌকোঘাটার দিকে।

'আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।' বলল মণ্টু।

'না দাদাবাবু, তোমরা শিগ্‌গির ফিরে যাও। আজ ভীষণ ঝড় আসবে মনে হচ্ছে। দেরি কর না।' বলল আরসাদ।

'কোথায় ঝড়! আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' বলল সিধু।

'ও আমরা বুঝতে পারি।' বলল আরসাদ, 'আজ রাতে ভীষণ কাণ্ড হবে দেখ। আর দেরি করো না তোমরা।'

নিরুপায় হয়ে ফিরল ওরা হাওয়া অফিসে। সেখানে ডাক্তারবাবু আর কবীর সাহেব অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

'এত দেরি করে?' বললেন ডাক্তারবাবু।

'আকাশের অবস্থা কেমন দেখলে আগে বল।' জিজ্ঞাসা করলেন কবীর সাহেব।

ওরা যা-যা দেখেছে বলল।—যে অদ্ভুত মেঘ দেখে এসেছে তার কথাও বলল।—শুনে চিন্তা যেন আরও বেড়ে গেল কবীর সাহেবের। আপন মনেই বললেন উনি, 'এর আগে কখনো এমন মেঘ এখানে দেখা যায়নি। ওই মেঘ ঝড়ের মেঘ।'

তখুনি উনি ওড়িষ্যার হাওয়া অফিসের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

চরার ওপর তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সে অন্ধকারেও আকাশের তারাগুলো দেখা গেল না। অদ্ভুত সেই মেঘটা বোধ হয় ততক্ষণে আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল। বহুক্ষণ রেডিও নাড়াচাড়া করে হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন কবীর সাহেব। ওদিক থেকে কোন সাড়াই উনি পাচ্ছেন না।

'ওদিকের রেডিও যন্ত্রের কি কোনো গোলমাল হলো নাকি ?' ঘরময় পায়চারি করতে করতে উনি বললেন। 'কিছুক্ষণ পরেই কলকাতাকে ডাকব আমি। কি যে হচ্ছে ওড়িষ্যার উপকূলে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার ভাল লাগছে না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন। খবর কিছু খারাপ হলে তো কলকাতাই আপনাকে জানাবে।'

আরসাদ ফিরে এল। কবীর সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'বাইরের অবস্থা কেমন দেখে এলে ?'

আরসাদ বলল, 'হাওয়ার জোর বেড়েছে খুব, সাহেব। আলো বেঁধে দিয়েছি খুঁটিতে। পরাণ মাঝির নৌকোর হদিস নেই। ঝড়খালি থেকে র‍্যাশন, চিঠিপত্র, এইসব নিয়ে আজই তো তার আবার ফেরার কথা।'

'হয়তো আরও বড় জোর দেড় ঘণ্টা সময় যাবে।' বললেন কবীর সাহেব, 'পরাণ যদি তার মধ্যে এসে না পড়ে তো বিপদে পড়বে। আলোটা নিভে যাবে না তো ?'

'আমি বিলিতি ঝড়ের লণ্ঠনটাই আজ জ্বেলে দিয়ে এসেছি।' বলল আরসাদ, 'ওটা বোধ হয় নিভবে না। আপনি চিন্তা করবেন না। পরাণ ঠিক এসে যাবে।'

'কিন্তু তারপর ?' আরসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কবীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানকার যন্ত্রগুলো যে ভয়ঙ্কর কথা বলছে। ওদিকে ওড়িষ্যার কোনো খবর পাচ্ছি না।' বোধ হয় ভীষণ ঝড়ে ওদের যন্ত্র খারাপ হয়ে গেছে। তাই যদি হয় তবে এই ঝড়ের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আগাম কিছুই জানতে পারব না। ঝড় হঠাৎ এসে পড়বে আমাদের ওপরে! সে যে হবে ভয়ঙ্কর ব্যাপার।'

আরসাদ বলল, 'যা হয় হবে, সাহেব। আপনারা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে নিন। রান্না হয়ে গেছে।'

ভাল করে খেতে পারলেন না কবীর সাহেব। খাওয়া শেষ হবার আগেই বাইরে বাতাসের বেগ ভীষণ হয়ে উঠল। ঘরের বন্ধ জানলাগুলোও সে হাওয়ার ধাক্কায় খট খট করে নড়তে লাগল।

কবীর সাহেবের সব কিছুই যেন কেমন হেঁয়ালী বলে মনে হতে লাগল মণ্টু আর সিধুর। ঝড়কে এত ভয় পাবার কি আছে? কোন বিপদের চিহ্নই ওরা খুঁজে পাচ্ছিল না কিন্তু যখন দেখল আরসাদেরও চোখে মুখে কেমন যেন একটা ভয়ের ভাব, তখনই ওরা বুঝল ভীষণ কিছু একটা হতে চলেছে। কিন্তু সেটা যে কি, তা ওরা বুঝতেই পারল না।

খাওয়া শেষ করেই কবীর সাহেব আবার গিয়ে ঢুকলেন তাঁর যন্ত্রপাতির ঘরে। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে তিনি জানতে চাইলেন নদীতে নৌকোর আলো দেখা গেছে কিনা। সে আলো এখনও দেখা যায়নি শুনে আরসাদকে একবার বাইরে গিয়ে আলোটা জ্বলছে কিনা দেখে আসতে বললেন।

আরসাদ যাচ্ছে যখন, তখন ডাক্তারবাবু বললেন, 'চল আমিও যাব তোমার সঙ্গে। এত হাওয়ার মাঝে একলা যাওয়া ঠিক নয়।'

'তাই যান।' বললেন কবীর সাহেব, 'কিন্তু যদি বোঝেন হাওয়ার বেগ অতি ভয়ঙ্কর, দুজনেই তখুনি ফিরে আসবেন।'

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের সমস্ত জিনিসগুলো হঠাৎ হাওয়ার ধাক্কায় ভীষণভাবে নড়ে উঠল। মণ্টুর মনে হলো ওর কানে যেন তালা ধরে গেল। ও আর সিধু প্রাণপণে চেষ্টা করে দরজাটা আবার বন্ধ করল যখন, তখন ওদের হাঁপ ধরে গেছে।

নৌকোর মাঝিদের জন্য কেন যে এত ভাবছেন কবীর সাহেব তা এতক্ষণে বুঝতে পারল ওরা। এ ভীষণ হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে পরাণ কি তার নৌকো নিয়ে আসতে পারবে? তবে আসার সময় ঝড়ের মধ্যে পরাণ আর মাঝিদের ওরা যেমন

দেখেছে তাতে কিন্তু মনে হয় কোনো ঝড়ই ওদের কাবু করতে পারবে না। হয়তো ওদের খুব কষ্ট হবে। কিন্তু সে কষ্টের জন্য মোটেও ভাবে না ওরা। রোজ নদীতে যারা নৌকো বায় ঝড় বৃষ্টিকে কি তারা ভয় করবে!

বাইরে তখন একটানা হাওয়ার শব্দ হচ্ছে। জানলার কোলে ফুটো দিয়ে সে হাওয়া ঘরে ঢুকছে হাল্কা শিসের শব্দ করে।

সিধু চুপি চুপি বলল, 'সবাই ভয় পেয়েছে, বুঝলি মণ্টু। ঝড়টা তাহলে বেশ জোরেই আসছে, কি বলিস্?'

'কি জানি।' বলল মণ্টু, 'বাবা কেন এখন বাইরে গেল বল তো!'

'সে তো পরাণ মাঝির নৌকো এল কিনা দেখতে।' উত্তর দিল সিধু।

'সে নৌকো তো বারান্দায় দাঁড়িয়েও দেখা যায়।' বলল 'মণ্টু, তা না করে এত ঝড়ে মিছিমিছি বাইরে যাবার কি দরকার ছিল?'

সিধু বলল, 'তুই কাকার কথা ভাবছিস, কিন্তু একবারও ভাবছিস না এত ঝড়ের মধ্যে পরাণ মাঝি পীর বাবার দহ পার হয়ে আসবে কেমন করে।'

হঠাৎ তখনি যন্ত্রঘর থেকে বার হয়ে এলেন কবীর সাহেব। ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'যাও যাও, তোমরা কাঁচের জানলাটার কাছে যাও তো। দেখ দূরে জলের বুকে কোথাও কোনো আলোর চিহ্ন দেখতে পাও কিনা? দেখলেই বলবে।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই ওরা ছুটে গিয়ে দাঁড়াল ছুটো জানলার পাশে। ভাল করে দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে আলোর নিশানা খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ সিধু চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ দেখ, ঐ দূরে, অন্ধকারের বুকে একটা আলো যেন অল্প অল্প ছলছে। ও নিশ্চয়ই পরাণ মাঝির

নৌকো !'

ভাল করে সে আলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মণ্টু বলল, 'হ্যাঁ, আলোটা এগিয়েই আসছে আস্তে আস্তে। তাহলে ওটা পরাণ মাঝির নৌকোই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তাই হবে', বলল সিধু। সামনের ঝোপটা থাকার জন্য নৌকোঘাটার আলোটা তো এখান থেকে দেখাই যায় না। আর সে আলো এগিয়ে আসবে কেন?'

'যাক, বাঁচলাম।' বললেন কবীর সাহেব, 'একটা ভাবনা গেল।' কথার শেষে উনি আবার গিয়ে ঢুকলেন তাঁর যন্ত্রঘরে।

'চল, আমরাও নৌকোঘাটায় যাই,' বলল মণ্টু, 'বেশ একটা এ্যাড্ভেঞ্চার হবে তাহলে। যাবি?'

'চল', বলল সিধু, 'আমারও ঝড় দেখতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে।'

আস্তে দরজাটা আবার খুলতে গেল ওরা, কিন্তু খিল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। তখনি বুঝল ওরা, বাইরে হাওয়ার বেগ ভয়ঙ্কর। চেঁচিয়ে সিধু যেন কি বলল। সে কথার কিছুই বুঝতে পারল না মণ্টু। এমন ঝড়ের মাঝে বার হওয়া উচিত হবে কিনা তাও ঠিক বুঝতে পারল না ও। ভাবল সিধুকে বারণ করবে যেতে। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা হলো ওর। কি ভাববে সিধু। ঝড়কে ভয় পেয়েছে ও। সামান্য একটা ঝড়। না, তা কখনও হতে পারে না। ঝড়ের বাতাস ঠেলে এগিয়ে গেল মণ্টু। তাই দেখে সিধুও এগোল ওর পেছন পেছন।

খানিকটা এগিয়েই ওরা বুঝল কি ভয়ানক ভুলই না করে বসেছে ওরা। ঝড় বলতে এতদিন যা বুঝত ওরা, এ তা নয়। এর বাতাসের বেগ অনেক বেশি। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, বোধ হয় ওদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বাতাসের সঙ্গে চরের যত আলগা বালি উড়ছে। তীরের মতো তা বিঁধছে গায়ে মুখে। নিশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আসছে হাওয়ার চাপে। সোজা হয়ে ওরা দাঁড়াতে

পারল না! কোনো মতে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছল নৌকোঘাটায়। নৌকো অনেক আগেই তীরে ভিড়েছে। মাঝিরা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধছে নৌকোটাকে খোঁটার সাথে।

ওদের দেখেই আরসাদ ধমকে উঠল। 'তোমরা এখানে এলে কেন? যাও ফিরে যাও, দেখছ না ভীষণ তুফান উঠেছে।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ বাতাস থেমে গেল। সমস্ত চর জুড়ে বাতাসের যে গোঁঙানি শোনা যাচ্ছিল তাও হঠাৎ থেমে গেল। অবাক হল মন্টু, ব্যাপার কি! হঠাৎ এমন করে বাতাস থেমে গেল কেন! নিশ্চয় তাহলে একটা কিছু ঘটতে চলেছে, তাই মনে হলো ওর! জনপ্রাণীহীন সমস্ত চরটা যেন কেমন একটা ঘুমন্ত পুরী হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোন কিছুর সাড়া শব্দ নেই। চারদিকের সব কিছু যেন থমকে আছে হঠাৎ কিছু ঘটার জন্য!

পরাণ মাঝির চিৎকার শোনা গেল তখুনি—'দৌড়াও সকলে হে, দৌড়াও হাওয়া আপিসের দিকে, দেখতে পেতেছনি হাওয়া থেমে গেছে। এখুনি তুফান এল বলে। পালাও পালাও সবাই। বাঁচতে চাও তো আর দেরি কোরোনি।'

নৌকোর আড়াল থেকে বার হয়ে এলেন ডাক্তারবাবু। এল পতিতপাবন, ছটকু, বিশে আর আলিমুদ্দিন। লাফ দিয়ে নৌকো থেকে নাবল পরাণ মাঝি।

সামনে আরসাদকে দেখেই বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন সংএর মতন। কি সব্বোনাশ যে আসতেছে তা কি বুঝতে পারতেছনি? দৌড়াও সকলে হাওয়া আপিসের দিকে। আর দেরি করোনি।'

সকলেই দৌড়াতে শুরু করল। ঝোপ-জঙ্গলটার কাছাকাছি যখন পৌঁছলো ওরা তখনি আবার হাওয়া ছাড়ল। একটা দমকা বাতাস একরাশ ধুলো নিয়ে এল প্রথমে। তার পরেই একসঙ্গে

যেন হাজার দৈত্য পাগলের মতো সমস্ত চর জুড়ে দাপাদাপি শুরু করল! কি ভয়ঙ্কর তাদের গোঁঙ্গানি! দম ফেটে যাচ্ছিল সিধু আর মণ্টুর।

তবুও থামল না ওরা। বহু কষ্টে এক সময়ে এসে পৌঁছাল হাওয়া অফিসের দরজায়। দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়েছেন কবীর সাহেব। বন্ধ দরজায় ওরা দুম দুম করে ঘা মারতে লাগল। দেখতে দেখতে হাওয়ার বেগ আরও বাড়ল। সে বেগ এত ভয়ঙ্কর যে, ওদের দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হতে লাগল। বাতাসের গর্জনে ওদের ধাক্কার শব্দ পর্যন্ত চাপা পড়ে গেল। ভয় হতে লাগল ওদের। যদি দরজা না খোলেন কবীর সাহেব এখুনি, তবে হয়তো আর কিছুক্ষণ বাদেই ওরা হাওয়ার মুখে উড়ে যাবে। প্রাণপণে ওরা দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। একে একে সবাই এসে জড়ো হলো ওদের চারপাশে।

হঠাৎ বৃষ্টি নামল মুষলধারে। বড় বড় ফোঁটাগুলো গুলির মতো ছিটকে এসে পড়তে লাগল চার পাশে। হাওয়ার গোঁঙ্গানির সঙ্গে মিশল বৃষ্টি পড়ার একঘেয়ে আওয়াজ। ওদের মনে হলো যেন চরার সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। হয়তো হাওয়ায় হাওয়া অফিসের পাকা বাড়িটাও কাত হয়ে পড়ে যাবে এখুনি। দুম দুম করে ওরা দরজায় ধাক্কা দিতেই লাগল।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল ভীষণ শব্দ করে। মুহূর্তে হাওয়া ঢুকে ঘরের সব কিছু ছিটিয়ে ছড়িয়ে ফেলল চারদিকে। সে সব দেখার সময় ওদের ছিল না। সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে একসাথে মিলে প্রাণপণ চেষ্টায় আবার দরজাটা বন্ধ করল। বাইরের প্রচণ্ড আওয়াজ তখুনি যেন কমে গেল অনেক।

মণ্টু দেখল, ওরা সবাই কাঁপছে ঠকঠক করে। ভয়ে না ঠাণ্ডায় তা ও বুঝতে পারল না। একটু সুস্থ হতে দেখল, ঘরের এক দিকে দাঁড়িয়ে আছেন কবীর সাহেব। তাঁর মুখের

দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারল না মণ্টু। কি ভীষণ অন্যায় যে আজ করেছে ওরা দু'জনে, তা তো ওদের জানা। ঝড় থামলে নিশ্চয়ই কবীর সাহেব তা নিয়ে কিছু বলবেন।

কবীর সাহেব বললেন, 'ভিজে কাপড়ে থেকো না কেউ। আরসাদ, সবাইকে যা হোক কিছু দাও। তারপর সবাই মিলে ঘরটাকে আবার গুছিয়ে ফেল।'

কথার শেষে কবীর সাহেব আবার ফিরে গেলেন তাঁর যন্ত্রঘরে। স্পষ্ট দেখছে মণ্টু কবীর সাহেবের মুখে কেমন যেন একটা ভয়ের ছাপ।

পরাণ মাঝি বলল।—'আমার কিন্তু হাওয়ার গতিকে ভাল মনে হতেছে না। বিলিতি যন্তর কি বলতেছে ঝড়ের কথা শুনি?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'চল আমরা কবীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করি গিয়ে। আশপাশের অন্য কোনো অফিস থেকে তিনি কিছু শুনেছেন কিনা।'

ওদের দেখেই কবীর সাহেব মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'খুব খারাপ খবর। কলকাতা থেকে এইমাত্র খবর দিল প্রচণ্ড একটা ঝড় বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে বাঙ্গলার দক্ষিণ উপকূলের দিকে। ঝড়ের গতি ঘণ্টায় একশো চল্লিশ কিলোমিটার। সমুদ্র ফেঁপে উঠতে পারে। আর তা যদি হয় তো এ হাওয়া অফিস ছেড়ে আমাদের এখুনি সরে যেতে হবে চরার উত্তর দিকে।'

'কিন্তু সমুদ্র তো এখান থেকে বেশ দূরে চাচা!' বলল মণ্টু।

'তাতে কি! জল যদি কুড়ি পঁচিশ মিটার উঁচু হয়ে আসে তো এ হাওয়া অফিস ভেঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।' বললেন কবীর সাহেব।

'তাহলে এখন আমরা কি করব?' জিজ্ঞাসা করল সিধু।

'ঠিক বুঝতে পারছি না।' অসহায়ভাবে বললেন কবীর

সাহেব। 'এই ভীষণ ঝড়ে বাইরে থাকাও কি সহজ ব্যাপার।'

পরাণ মাঝি বলল, 'আমার কিন্তু বলার একটা কথা আছে।'

'কি তুমি বলবে বল।' বললেন কবীর সাহেব।

'চলুন, সবাই লাওএ চলুন। তেমন বুঝলে লাও ছেড়ে মাঝ দরিয়ায় ভেসে যাব। তাতে বিপদ কম।' বলল পরাণ মাঝি।

'কিন্তু চরার উত্তর দিকে গেলেও তো আমরা বাঁচতে পারি।' বললেন কবীর সাহেব।

'সে দিক পানে যে জল বাড়বেনি তার কি নিশ্চয় আছে? বানের জল ফেরার টানে আমাদের ভাসিয়ে নে যেতে পারে।' বলল পরাণ মাঝি, 'লাওএ চলুন সবাই,—বিপদ তাতেই কম।'

কবীর সাহেব তখুনি আবার রেডিওর চাবি ঘোরাতে লাগলেন। যদি কোনোখান থেকে কোনো খবর পান। রেডিওতে ভেসে এল কতগুলো অদ্ভুত শব্দ,—কোঁ কোক্ কোক্ কোঁ কোঁ। কোঁক।

কবীর সাহেব বললেন, ঝড়ে জাহাজ পড়েছে! বিপদ হয়েছে নিশ্চয় জাহাজটার, তাই এস্ ও এস্ পাঠাচ্ছে।

রেডিওর চাবি আর একটু ঘোরাতেই স্পষ্ট শোনা গেল,— 'দক্ষিণ উপকূলের উপর দিয়েই এ ঝড়ের গতিপথ। ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় একশো চল্লিশ কিলোমিটার। আশঙ্কা করা হচ্ছে এই ঝড়ের ফলে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। তাই সমুদ্র উপকূলের সমস্ত গ্রামবাসীদের অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে। অঞ্চলগুলির থানা অফিসার, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের জানান হচ্ছে তাঁরা যেন এখুনি সমস্ত গ্রামের অধিবাসীদের স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এ আদেশ অমান্য করলে প্রচুর প্রাণ হানির সম্ভাবনা। দক্ষিণে কোপবতী নদীর মোহনায় মজিদ মিয়াঁর চরে আমাদের যে হাওয়া অফিস আছে এ ঘোষণায় সেখানকার কর্মচারীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন এখুনি স্থান ত্যাগ করেন।

ওড়িষ্যা উপকূলের হাওয়া অফিসের শেষ খবরে বোঝা যায় ঝড় প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে মজিদ মিয়াঁর চরের দিকেই।—তাঁদের আবার অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করেন। বাংলাদেশের আবহাওয়া দফতরকেও এই ঝড়ের খবর দিয়ে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ ঘোষণা আপনারা শুনছেন অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্র থেকে। আবার আবহাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ ঘোষণা রাত আটটা বেজে কুড়ি মিনিটে করা হবে।'

রেডিও বন্ধ করে কবীর সাহেব বললেন, 'যন্ত্রঘরের সব দরজা জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ আছে কিনা দেখ আরসাদ।—তারপর বাড়ির অন্য দরজা জানলা বন্ধ কর। বাইরের দরজায় তালা দিয়ে আমরা যাব।'

সকলেই দরজা জানলা পরীক্ষা করে দেখল। মাঝের দরজা-গুলোও বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে দিল। শেষ দরজাটা বন্ধ করে আরসাদ বলল। 'সাহেব, আর দেরি করবেন না। আসুন তাড়াতাড়ি।'

পরাণ মাঝি জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা তাহলে কোথায় যেতেছি সাহেব?'

'তোমার নৌকোয়।' বললেন কবীর সাহেব, 'শুনলে না রেডিওর ঘোষণা!'

বাইরে যাবার দরজাটার সামনে এসে আরসাদ বলল, 'আপনারা সবাই দু'পাশের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ান। আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। দরজা খোলা হলেই আপনারা এক এক করে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বার হবেন। সাহেব, আপনি আগে যাবেন।—দাদাবাবুরা তারপর। সবার শেষে আমি। কেউ যেন বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করবেন না। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাহলে। বিপদ দেখলে বরং মাটিতে

শুয়ে পড়বেন। তারপর একটু একটু করে বুকে হেঁটে এগোবেন। —ভুলবেন না যেন কথাগুলো।'

কারও মুখে কোনো কথা এল না। সবাই শুধু মাথা নাড়ল। একটা ছোট লাঠি হাতে নিয়ে দরজার কাছে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল আরসাদ। অন্য সবাই দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ালে, বহু কষ্ট করে দরজার খিলটা খুলে ফেলল আরসাদ। দড়াম্ করে প্রচণ্ড শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। মুহূর্তে কি যেন ঘটে গেল ঘরের মধ্যে। কানের পর্দা চড় চড় করে উঠল অনেকের। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার মতো হলো। হাঁপ ধরে গেল মণ্টুর! কিছু ভাল করে বোঝার আগেই কবীর সাহেব ওর হাত ধরে টান দিয়ে মাটির সাথে মিশে গিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন। কিছুই আর ভাবতে পারল না মণ্টু। সিধুর হাতে ঠিক তেমনি একটা টান দিয়ে কবীর সাহেবের মতনই ও ঘর থেকে বার হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে যখন এসে পৌছাল বারান্দায়, তখন মনে হলো বাইরে বোধ হয় প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

প্রায় গড়িয়ে গড়িয়েই কবীর সাহেব উঠোনে নামলেন। তেমনি করেই নামল মণ্টু। নামার সময় দেখতে পেল আরও কজন ঠিক ওর পাশেই অমনি করে নামছে।—যাক্, ওরাও তাহলে আসছে পিছন পিছন। মাটির সঙ্গে মিশে থাকার জন্য হাওয়ার ধাক্কা তত লাগছিল না। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন ছুঁচের মত বিঁধছিল গায়ে। তাছাড়া অমন করে বুকে হেঁটে এগোতেও যেন মনে হচ্ছিল দম আটকে যাবে।

অমন করে শুয়ে শুয়েই আরসাদ চেঁচিয়ে উঠল, 'সমুদ্রের জোয়ার এসে গিয়েছে। জলের তোড়ে নৌকো কি ঠিক জায়গায় আছে? ভাল করে দেখে এগোও সকলে।'

ওর কথাগুলো সবাই শুনতে পেল কিনা কে জানে। বাতাসের গোঙ্গানী আর বৃষ্টির শব্দে কথাগুলো হারিয়ে গেল।—কিন্তু কোন

দিকে নৌকো, সামনের ঝোপ-জঙ্গলটাই বা কোন দিকে?—সিধুই বা গেল কোন দিকে? স্পষ্ট বুঝল মণ্টু এখন তার অন্যের কথা ভাবার সময় নয়। ঠিক দিকে ঠিক মতো এগিয়ে যেতে হবে। ওর মনে হলো যেন রাতের গভীর অন্ধকারের সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর তুফান আজ ওদের সর্বনাশ করবে বলেই আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সবাইকে ফেলে ও একলা কি করে যাবে? ও তো স্বার্থপর কাপুরুষ নয়। না না, সবাইকে ফেলে ও একলা নৌকোয় উঠতে পারবে না। সবার যা হবে, ওরও তাই হোক।

বহু কষ্টে পাশ ফিরে ও পেছন দিকে তাকাল। ঝাপসা চোখে আশপাশ চারদিকে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করল। কিছুই ও দেখতে পেল না। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল ওর। তবে কি সবাই ওকেই ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। না না, তাও হতে পারে না। সিধু, বাবা, কবীর সাহেব, তারা তো এমন কখনও করবে না! আর পরাণ মাঝি, সে কি সবাইকে ফেলে নৌকো ভাসিয়ে দেবে প্রাণের ভয়ে?

হঠাৎ পিছনে ধাক্কা খেল মণ্টু, কে যেন কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'থামলে কেন দাদাবাবু? এগোও।'

'আরসাদ! সিধু কোথায়?' জিজ্ঞাসা করল মণ্টু।

উত্তরে কি যে বলল আরসাদ তা ও বুঝতে পারল না। আবার ধাক্কা খেয়ে এগোতে লাগল সামনে।

হঠাৎ মনে হলো, ওর বুকের নিচে জল যেন বাড়তে শুরু করেছে। এ জল বৃষ্টির নয়। এ তবে সমুদ্রের জল! ঝড়ের ধাক্কায় সমুদ্রের জল চরার ওপরে এসে গিয়েছে! এ কি তবে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের আগের অবস্থা? ভয় হলো মণ্টুর। হাঁকুপাকু করে এগিয়ে চলল ও। নৌকোটা আর কতদূরে? পৌছতে কি পারবে ও সেখানে? অন্য আর সকলে কি এগিয়ে গিয়েছে? আরসাদ তো সবার পিছনে ছিল। ও তবে এল কি করে ওর

পাশে ? তবে কি ও অন্য সবার মতো এগোতে পারছে না ? এমন করে কি ও শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে ? হাওয়ার বেগে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না ও। উঁচু নীচু জমির ওপরে জল দাঁড়িয়ে এগোনো অসম্ভব করেছে। নাকে-মুখেও যে জল ঢুকছে। আর কিছু পরেই হয়ত এ জল ডুবজল হয়ে দাঁড়াবে। ও আর এগোতে পারবে না। যাক, অন্য সকলে চলে যাক ! ওর জন্যে কেন অন্যরা মরবে ? সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের আগেই নৌকোতে উঠুক গিয়ে আর সবাই।

তারপর ভয়ঙ্কর সেই জলোচ্ছ্বাসে ও ভেসে যাবে। ফুলতলিতে আর ফিরে যেতে পারবে না। বাদাম গাছের খোঁড়োলের সেই তক্ষকটাকে আর দেখা হবে না। সেখ সদর আলি সাহেব মেঘ দেখলে নাও ছাড়তে বারণ করেছিলেন। কেন সে বারণ শুনল না ওরা।

'এগোও, এগোও দাদাবাবু।' আরসাদ আবার এসে ওকে ধাক্কা দিল, 'আর তো এসে গিয়েছি। সেই ঝোপ-জঙ্গলটা আমরা পার হয়ে এসেছি। আর কিছুটা এগোলেই নৌকো।'

'আমি দিক হারিয়ে ফেলেছি,' বলল মণ্টু, 'আমি আর পারছি না।'

'হেই দেখ, সে কি কথা গো !' হঠাৎ ঝড়ের মধ্যে পরাণ মাঝির গলা শোনা গেল, 'সবার অবস্থাই কাহিল, তা দেখতে পেতেছনি ! এগোও, এগোও।'

একটু ঘাড় তুলে চারদিকটা দেখতে গেল মণ্টু। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, কে যেন ওর ঘাড় ধরে মুচড়ে দেবার চেষ্টা করছে। চট করে আবার মাথা নীচু করেই ও এগোতে লাগল। সবাই ওর চারপাশেই আছে ; কেউ ওকে ফেলে চলে যায়নি। যাবেও না। তবে কিসের ভয় ? জল আরও বেড়েছে যেন, মনে হলো মণ্টুর। আর একটু বাড়লেই ওকে সাঁতার কাটতে হবে। কিন্তু নৌকোটা যে কোন্ দিকে তা ও বুঝতে পারল না। হঠাৎ সিধুর গলা শুনতে পেল ও, হতাশ ভাবে ও যেন বলল, 'নৌকো ভেসে গিয়েছে ! আমরা যাব কেমন করে !'

'বাজে কথা!' কে যেন ধমকে উঠল! 'ঝড়ের ঠেলায় আর জলের ধাকায় নিশ্চয়ই নৌকো তীরে উঠে গেছে। সবাই খোঁজো নৌকো কোন দিকে', এ গলা কবীর সাহেবের।

'হাওয়া ছেড়েছে বারদরিয়া থেকে। লাও ভেসে যাবেনি,' বলল পরাণ মাঝি। 'নিচ্চয় লাও চরার জমিতে এটকেছে। ওরে তোরা লাও কোনদিক পানে দেখরে, সবাই দেখ্।'

'ঐ তো নাও উঠে এসেছে ওদিক পানে!' বলল পতিত-পাবন, 'আপনারা সবাই ডান দিক ঘেঁসে এগোন। নাওয়ের আড়ালে গেলে তুফানের চোট কম লাগবে।'

কে যেন মন্টুকে ধাক্কা দিয়ে বুঝিয়ে দিল কোন দিকে যেতে হবে। ও প্রাণপণে সেদিকেই এগোতে লাগল। বেশ কিছুটা এগিয়েই হঠাৎ মনে হলো ওর হাওয়ার বেগ যেন কেমন কমে গিয়েছে। তবে কি সত্যিই ও নৌকোর আড়ালে এসে পৌছেচে। একটু সাহস করে আবার ও মাথা তুলল। সামনের ঘন অন্ধকারের মাঝে আরও ঘন অন্ধকার যেন খানিকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকো! নৌকো! পরাণ মাঝির নৌকো! ও পৌছে গিয়েছে নৌকোর আড়ালে, তাতে আর সন্দেহই নেই!

একটু দম নিয়ে ও দেখল, ওর আগেই সেখানে পৌছে গেছেন কবীর সাহেব আর সিধু। এক এক করে সবাই এসে পৌছতে লাগল। সবাই হাঁপাচ্ছে। সবাই ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। নৌকোর ধার বেয়ে যে নৌকোর ওপরে উঠবে, সে ক্ষমতাটুকুও যেন আর কারো নেই।

'আর দেরী নয়।' চেঁচাল পরাণ মাঝি, 'উঠ্‌নগো সবাই লাওয়ে। সমুন্দুরের জল বাড়তেছে, লাও ভেসে উঠলে তাকে আর ঠেকানো যাবেনি। যে থাকবে সে থাকবে পিছনে পড়ে।'

আঁকুপাঁকু করে সবাই নৌকোর পাশ বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, হাওয়া বুঝি ছেঁড়া কাগজের মতো

ওদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। জল হু-হু করে বাড়ছে, নৌকোটাও যেন দুলতে শুরু করেছে। এখুনি তল আলগা হলেই হাওয়ার তোড়ে হুড়মুড় করে ছুটবে। সিধু বহু কষ্টে উপরে উঠে গেল। ছটকু আর বিশে তারপর, তারপর এক এক করে অনেকেই। মণ্টু যখন উপরের পাটাতনের ওপর একদম শুয়ে পড়ল, নৌকোটা তখন ভীষণভাবে দুলে উঠলো। মনে হলো যেন হাওয়ার তোড়ে ওটা উল্টেই যাবে। পাটাতনের কাঠ শক্ত করে ধরে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল মণ্টু। একটা কথা তখন ওর মনে হলো। সবাই কি উঠতে পেরেছে নৌকোয়? বাবা উঠেছেন তো?

কেন যেন মনে হলো মণ্টুর, এমন করে হাওয়া অফিস ছেড়ে বার না হলেই বোধ হয় ভাল হতো। সমুদ্রের জল বেড়ে চরার অনেকটা ভরিয়ে দিয়েছে ঠিক, কিন্তু কই জলোচ্ছাস তো হয়নি। ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেবার মতো কোন কিছুই হয়নি, তবে কেন এমন করে মরতে আসা।

নৌকোটা আবারও ভীষণভাবে দুলে উঠে কাত হলো। যেন তখুনি উল্টে যাবে। সবাই নৌকোর পাটাতন, বা অন্য কোন কিছু ধরে নিজেদের সামলালো। নৌকোর খোলের ভিতরে মালপত্র-গুলোয় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। ভয়ে চোখ বুজল মণ্টু—আর কোন সন্দেহ নেই, এ নৌকো এখুনি উল্টে গিয়ে সবাইকে চাপা দেবে।

হঠাৎ একটানা ঝড়ের আওয়াজ ভেদ করে পরাণ মাঝির গলা শোনা গেল। 'শিগগির অপর ধারে সরে যাও গো সকলে। শিগ্‌গির, শিগ্‌গির।'

তখনি আচমকা ওর চিৎকার, আওয়াজ, সব কিছুকে ছাপিয়ে দূর থেকে হঠাৎ ভেসে এল এক অদ্ভুত শব্দ, এমন শব্দ জীবনে শোনেনি মণ্টু। এমন শব্দ যে হতে পারে তাই জানত না। এ কিসের শব্দ! এমন শব্দ তুলে ক্রমশঃ কি এগিয়ে আসছে সামনের দিকে, এসে পড়ল বলে! কি হতে পারে ওটা? জলোচ্ছাস!!

মন্টুর মনে হল, যেন সমস্ত সমুদ্রটাই পাগল হয়ে ছুটে আসছে নৌকো সমেত সবাইকে ওদের ডুবিয়ে দেবে বলে।

আবারও সে আওয়াজ ছাপিয়ে পরাণ মাঝির চিৎকার শোনা গেল, 'সাবধান গো, সবাই সাবধান। সাগর ক্ষেপেছে। পাগল হয়ে ছুটে এসতেছে গো সমুনদুর।'

ওর চিৎকার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জলের প্রচণ্ড ধাক্কায় নৌকোটা থরথর করে কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই ছিটকে লাফিয়ে উঠল শূন্যে আকাশের দিকে। সেই অদ্ভুত শব্দটা যেন এসে ভেঙে পড়ল ওদের নৌকোর চারপাশে। কাত হওয়া নৌকোটার খোলে হুড়-হুড় করে ঠাণ্ডা জল ঢুকল অনেক। আর রক্ষা নেই এবারে, নৌকো ডুববে নিশ্চয়। পটাং করে একটা শব্দ হলো তখুনি। ঝপাং করে কি যেন পড়ল জলে। সঙ্গে সঙ্গেই নৌকোটা আবার লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে, তারপরেই ভীষণ ভাবে ঘুরপাক খেতে লাগল জলের ওপরে। ডুবে যায়নি নৌকো! এখনও ভেসে আছে জলের ওপরে!

ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখল মন্টু, সোজা হয়ে গিয়েছে নৌকো! ঘুরপাক খেতে খেতে সাঁই-সাঁই করে ছুটে চলেছে হাওয়ার বেগে পাগলা স্রোতের মুখে।

মন্টুর গায়ের ওপর দিয়ে কে যেন হিঁচড়ে চলে গেল অন্য দিকে। কি বলে যেন পরাণ মাঝি চেঁচিয়ে উঠল। কে যে শুনল সে কথা, কে জানে!

হঠাৎ নৌকোর ঘুরপাক বন্ধ হয়ে গেল। একমুখো তীরের মতো ছুটে চলল নৌকো। কি করে যে এমন হলো তা বুঝতে পারল না মন্টু। ভয়ে ভয়ে একটু মুখ তুলে তাকাল পিছন দিকে। জলের ছাঁটের মধ্যে দিয়ে যা দেখল ও, তা ওর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো না। ভুল দেখছে কি ও! আবারও তাকিয়ে দেখে অবাক হলো। পরাণ মাঝি নৌকোর হাল ধরেছে পিছনে।

দু'হাতে হালটাকে বাগিয়ে ধরে পরাণ মাঝি যুদ্ধ করছে ঝড়ের সঙ্গে।

লোকটা পাগল নাকি! এখুনি এক মিনিটের মধ্যেই ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ঝড়ে। এই ভীষণ ঝড়ে অমন ক্ষেপা নদীর জলে পড়লে ওকে আর খুজেই পাওয়া যাবে না। তবে এও ঠিক, অমন করে হাল ধরার জন্যেই নৌকোর ঘুরপাক বন্ধ হয়েছে। নৌকোও তাই চলেছে একমুখো। কিন্তু যাচ্ছে কোন দিকে! এই অন্ধকারে এমন ঝড়-বৃষ্টির মাঝে কোন দিকেই কোথাও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোথায় তীর! কোথায় ঝড়খালি!

না কি নৌকো ছুটে চলেছে বার-সমুদ্রের দিকে! হঠাৎ মনে হলো ওর, কোপবতী নদীর বুক জুড়ে মরণের ফাঁদ পেতে রয়েছে পীর বাবার দহ। এই প্রচণ্ড ঝড় যদি নৌকো টেনে নিয়ে যায় সে দিকেই? তবে কি অমন করে হাল ধরেও নৌকোকে বাঁচাতে পারবে পরাণ মাঝি! জলোচ্ছ্বাস মাটির বুক থেকে নৌকোকে মুক্তি দিয়েছে শুধু টেনে নিয়ে গিয়ে পীর বাবার দহের বুকে ফেলবে বলে। তারপর কি হবে! কেন তবে মিছিমিছি ঐ বোকা মাঝিটা অমন ঝড়ের সাথে লড়াই করে চলেছে? এই ঝড় এসেছে শুধু ওদের সমেত এই নৌকোটাকে গিলে ফেলবে বলে। কেউ একে আর বাঁচাতে পারবে না।

ঝড়ের শেষ নেই। বৃষ্টিরও শেষ নেই। শেষ নেই হাওয়ার বিশ্রী গোঙ্গানীর! তার মাঝেই নৌকোটা পরাণ মাঝির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ছুটে চলেছে। কোথায় তা কেউ জানে না। তবে এও ঠিক, পরাণ মাঝি না থাকলে নৌকোটা ডুবতই!

নৌকো ছুটেছে হাওয়ার মুখে হাওয়ার দিকে, তাই বোধ হয় ঝড়ের বেগ একটু কম বলে মনে হচ্ছে। নৌকোর লোকেরাও যেন বুঝতে পেরেছে সেকথা। একটু যেন নড়াচড়া করছে তারা এতক্ষণে। ওরই মধ্যে কবীর সাহেবের গলা শোনা গেল। ব্যাকুলভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবাই আছে তো নৌকায়?'

সবাই শুনতে পেল সে কথা। কিন্তু কেউই উত্তর দিল না।

উনি ভয় পেয়ে নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে ওঁর সেই ব্যাকুল ডাক শোনা যেতে লাগল।

ওদিক থেকে সিধু বলল, 'আমি এখানে আছি চাচা।'

'মণ্টু কোথায় ?'

'আমি এখানে,' বলল মণ্টু, 'বাবাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। বাবা কোথায় ?'

'আমি এখানে,' বললেন ডাক্তারবাবু।

'তবে জলে পড়ল কি তখন ?' জিজ্ঞাসা করল আরসাদ।

'আমি নৌকোর শেষ বাঁধন-রশিটা কেটে দিয়েছি,' বলল পতিতপাবন, 'রশির টানে নঙ্গরটা পড়েছে জলে। ও শব্দ তারই।'

'ছটকু, বিশে, আলিমুদ্দিন কোথায় ?' জিজ্ঞাসা করলেন কবীর সাহেব।

'আমরা সবাই আছি গো, সাহেব,' বলল আলিমুদ্দিন, 'আল্লার দয়ায় লাও-এর সবাই আছে গো আছে। কোন ভয় নেই গো আর।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকো আবার ভীষণ ভাবে দুলতে শুরু করল। নৌকোর চারপাশ ঘিরে যেন কেমন সব অদ্ভুত আওয়াজ হতে লাগল। যেন নৌকোটা ঘেঁসড়ে চলেছে কিছুর ওপর দিয়ে। তবে কি চারপাশে জলে ভেসে থাকা কিছুর ওপর দিয়ে চলেছে নৌকো !

'ও কিসের শব্দ ?' ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু।

কেউই কিন্তু তার সঠিক উত্তর দিতে পারল না।

পতিতপাবন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি ? কি হতেছে গো বড় মাঝি ? অমন আওয়াজ কেন ? লাও কি চরায় ফাঁসতেছে ?'

'না-না,' বলল পরাণ মাঝি, 'আমরা মজিদ মিয়াঁর চরের ওপর দে ভেসে চলেছি। ঝোপ জঙ্গলের গাছের ডালে ধাক্কা খেতেছে

লাও। ও শব্দ তারই।'

'সে কি!' অবাক হয়ে বললেন কবীর সাহেব।

'হ্যাঁ গো, গোটা মজিদ মিয়াঁর চরই ডুবেছে। ভাগ্যিস্, আমরা লাও-এ উঠেছিনু। কিন্তু এখন সাবধান। সাপ-খোপ উঠতে পারে লাও-এ।'

'নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না অন্যদিকে?' জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু, 'গাছের ডালে ধাক্কা লেগে যদি নৌকোর তল ফেঁসে যায়!'

'লাও-এর মুখ ঘোরাবার খেমতা আর মানুষের নেই গো', বলল পরাণ মাঝি, 'তাছাড়া এই ভাল, অন্য দিকে পীর বাবার গেরো রয়েছে না? ও দিক পানে লাও গেলে আর বাঁচতে হবেনি কাউকে।'

সরসর ঘসঘস শব্দ তুলে নৌকো ঝড়ের মুখে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে শক্ত কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সবার মনেই তখন একটা ভয়, যদি এত ধাক্কা এ নৌকো সামলাতে না পারে! কত বড় মজিদ মিয়াঁর চরের গাছগুলো? যদি নৌকোর তল ফেঁসে যায় ধাক্কায়!

মনে যার যাই থাকুক না কেন, মুখে কিন্তু এ নিয়ে কোনো কথা কেউ বলল না। কোনো মতে চর পার হতে পারলে তবেই আশা।

হাওয়ার বেগ কি একটু কমেছে? নাকি জঙ্গলের গাছ-পালাতে বাধা পেয়ে নৌকোর গতি কমেছে? বৃষ্টির কিন্তু একটুও কমতি নেই। এমন যদি চলে আরও কিছুক্ষণ, তবে তো নৌকোর খোলে জল জমেই নৌকো ডুবে যাবে!

কথাটা মনে হলো কবীর সাহেবের। এখনই এ নিয়ে একটা কিছু করা দরকার। পরাণ মাঝিকে বলা দরকার কথাটা। কিন্তু কিছু বলার আগেই পরাণ মাঝি চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে তোরা আর এলিয়ে থাকিস নে রে, নে-নে, উঠে পড়। লাও-এ ছেচ মারতে হবে। ওঠ-ওঠ, উঠে পড়লি তোরা?'

সবার আগে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল আলিমুদ্দিন। তারপর আর অন্য সকলে। নৌকোর কিনারে অনেক কষ্ট করে বসল ওরা।

পরাণ মাঝি আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখিস বাবা, সবাই সাবধানে বসিস। উবগার করতে গিয়ে জলে পড়লে আর খুঁজে পাবনি।'

কিন্তু ওরা জল তুলে ফেলবে কি দিয়ে? হাওয়ায় নৌকোর যা কিছু ছিল সব উড়িয়ে নিয়েছে। হাতের কাছে তবুও যা পেল তা দিয়েই ওরা নৌকোর খোলের জল তুলে বাইরে ফেলতে লাগল। কিন্তু যা বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে এ কাজ ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই না! কিছুক্ষণ চেষ্টা করে ওরা হতাশ হয়ে ছেড়ে দিল।

সর সর ঘসঘস আওয়াজ তুলে প্রচণ্ড দুলুনির সাথে নৌকো আপন মনেই এগিয়ে চলল। আরও কিছুক্ষণ এমনিভাবে চলার পর হঠাৎ সেই অদ্ভুত আওয়াজ থেমে গেল! বিশ্রী দুলুনিও বন্ধ হল। নৌকো তাহলে ঝোপ-জঙ্গলের সীমা পার হয়ে এসেছে। হয়তো কোপবতীর অন্য খাড়িতে এসে পড়েছে নৌকো। নৌকোর তলা খসে যায়নি! নৌকো এখনও ডোবেনি! ভেসে যায়নি পীর বাবার দহের দিকেও! তাছাড়া মজিদ মিয়াঁর চরের সব ক'জনই আছে নৌকোর ওপরে!

মণ্টু ভাবল, তবে কি আর কোন ভয় নেই? এ ভয়ঙ্কর ঝড়ে আর কি কোন ক্ষতিই হবে না ওদের? ঝড় সামলে এক সময়ে গিয়ে ওরা পৌঁছাবে ঝড়খালি! এই যে এখন ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে, বাড়ি ফিরে গিয়ে তখন বুক ফুলিয়ে এই ভয়ানক এ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলবে সবাইকে। শুনে অবাক হবে সকলে। ইস্কুলের ছেলেরা বলবে, 'চল, আমরাও একদিন যাব মজিদ মিয়াঁর চরে; চিঠি লেখ তুই, তোর কবীর চাচার কাছে।' সেদিনও ও আবার আসবে মজিদ মিয়াঁর চরে; ওর স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে। এত ভয়ঙ্কর বলেই না আজ এত ভাল লাগছে ওর।

বাড়ির কথা, স্কুলের কথা, বন্ধুদের কথা, সব তখনি মনে

পড়ল মণ্টু। কিন্তু আর কি ফেরা হবে ফুলতলিতে? আর কি দেখা হবে কারও সঙ্গে? এমন করে আর কতদূর যাবে এ নৌকো? খোল ভর্তি জল নিয়ে এটা ডুবে যাবে নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত!

'হেই দেখো, সকলকে কি ভূতে ধরল! লাও-এর খোলের মিঠা জলের টিনগুলা বার কর তোরা। আপনারা হাতের কাছে যা কিছু পান তা নিয়ে লাও ছেচ মারুন। নিন, দেরী করবেন না!' চেঁচিয়ে উঠল পরাণ মাঝি, 'নইলে লাও বাঁচবেনি।'

বহুকষ্টে পাটাতনের কিছুটা কাঠ সরিয়ে ফেলে প্রাণপণে সবাই খোলের জল তুলে বাইরে ফেলতে লাগল।

এ বৃষ্টি কি আর থামবে না? হাওয়ার বেগও কি বন্ধ হবে না! না হোক, ভয় পেয়ে চুপ করে বসে বসে মরতে পারবে না কেউ। শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে এই ঝড়ের সঙ্গে। ষাট বছরের বুড়ো পরাণ মাঝি যদি অমন শক্ত হাতে নৌকোর হাল ধরতে পারে, তবে কেন ওরা পারবে না? খোলের মধ্যে জিনিষ-গুলো ভেঙ্গে চুরমার। তারই একটি টিন তুলে নিয়ে প্রাণপণে খোল থেকে জল তুলে বাইরে ফেলতে লাগল মণ্টু। পরাণ মাঝি যখন নৌকোর হাল ধরেছে, তখন শেষ চেষ্টা না করে ঝড়ের কাছে হার মানা হবে কাপুরুষের কাজ।

নৌকো আবার নদীতে পড়েছে। মজিদ মিয়াঁর চর যে পেছনে কোথায় কোন দিকে পড়ে রইল কে জানে। থাক পড়ে, এখন ভাবতে হবে ঝড়খালির কথা! এই ঝড় বৃষ্টি, এই গভীর অন্ধকার ভেদ করে সেখানেই পৌছাতে হবে।— হবেই।

এত জোরে ছুটছে নৌকো, যদি ঠিক দিকে যায়, তবে তো নদীর পারে পৌছাতেও বেশিক্ষণ লাগবে না। তাই যেন হয়। এই ঝড়ে নদীর বুকে থাকার চেয়ে শক্ত জমির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভাল।

প্রাণপণে আবার জল তুলে বাইরে ফেলতে লাগল মণ্টু।

কাজ করলে সব কিছু ভুলে থাকা যায়। কি সব আজে বাজে কথা ও চিন্তা করেছে মিছেমিছি এতক্ষণ।

অন্য কারও মুখে কোন কথাই নেই। ওরাও প্রাণপণে জল তুলে ফেলছে বাইরে। তবে তো ওরাও বুঝতে পেরেছে, যতক্ষণ পরাণ মাঝি আছে হালে ততক্ষণ কোন ভয় নেই। শুধু পরাণ মাঝির কথামতো যে-যার কাজ করে যাও। ব্যস, তাহলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

নৌকো আরও কিছু দূর ছুটে চলল আপন খেয়ালে ঝড়ের মুখে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে কি হলো কে জানে, আচমকা এক পাক খেয়ে নৌকো আবার অন্যমুখো ঘুরে গেল! স্পষ্ট দেখেছে মণ্টু. পরাণ মাঝি প্রাণপণে হালটাকে মোচড় দিয়েও নৌকোর মুখ আর ফেরাতে পারল না! আচমকা হাওয়ার তোড়ে অসম্ভব কাত হয়ে নৌকো আপন খেয়ালে পাগলের মতই ছুটে চলল নতুন আর এক দিকে। যারা উঠে বসে জল সেচে ফেলছিল, নৌকোর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কোন মতে ওরা নিজেদের সামলাল। সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই নৌকোও আবার সোজা হয়ে গেল। তারপরই ঝড়, বাতাস আর বৃষ্টির এক অদ্ভুত পাগলামি শুরু হয়ে গেল। সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো।

ঢেউগুলো ভীষণভাবে লাফালাফি শুরু করে দিল। নৌকোর ছই অনেকক্ষণ ধরে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলছিল, হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে উড়ে গেল। কবীর সাহেব সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন। কোথায় যেন তাঁর আঘাত লেগেছে!

সিধু কোনোমতে নিজেকে তাঁর সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল। 'কোথায় আপনার লেগেছে চাচা, দেখি।'

উত্তরে কবীর সাহেব ধমকে উঠলেন, 'যাও, নিজের কাজ কর গিয়ে, জল সেচা বন্ধ করলে নৌকো বাঁচান যাবে না।' কথার শেষে তিনি আবার প্রাণপণে জল তুলে বাইরে ফেলতে লাগলেন।

সবাই আবার নিজেদের কাজ আরম্ভ করল। সিধু দেখল, অত বৃষ্টির মধ্যেও দেখতে দেখতে কবীর সাহেবের পিঠের কাছের এক জায়গায় জামা লাল হয়ে উঠল। কি যে করবে ও ভেবে পেল না। এত ভীষণ বৃষ্টির মাঝে করারও কিছুই নেই। আর কিছু করতে গেলেই কবীর সাহেব বাধা দেবেন।

ওর মনের কথা বোধ হয় কবীর সাহেব বুঝতে পারলেন। বললেন, 'সামান্য কেটে গিয়েছে আমার। ও কিছু নয়। যাও নিজের কাজ কর। এখন পরাণ মাঝির হুকুম মেনে চল। তাতেই সবার ভাল হবে।'

সিধু ফিরে গিয়ে আবার জল ফেলার কাজে লেগে গেল।

কবীর সাহেব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও বড় মাঝি, নৌকো হঠাৎ এমন করে ঘুরে গেল কেন? এখন আমরা চলেছি কোন দিকে?'

হাঁপাতে হাঁপাতে পরাণ মাঝি বলল, 'তুফানে লাও-এর মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে গো সাহেব। মনে হতেছে আমরা এখন চলেছি পীর বাবার আক্রোশের দিকে। বাবা আজ রুষ্টো হয়েছেন গো। সহজে ছাড়বেননি।'

'এ নৌকো কি তবে বাঁচবে না?' ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কবীর সাহেব, 'এতগুলো লোক বেঘোরে মরবে!'

'চুপ কর সাহেব, চুপ কর।' বলল পরাণ মাঝি, 'আমার দেহে পরাণ থাকতি তা হবার লয়। পীর বাবার ঠেয়ে আমি তো কোনো অলেহ্য কিছু করিনি। আমি শেষ পরযন্ত যুঝে যাব। তারপর যা হবার হোক।'

হঠাৎ দুম করে কি যেন এসে ধাক্কা মারল নৌকোটার মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল আলিমুদ্দিন, 'জেলে ডিঙ্গি মনে হতেছে গো বড় মাঝি। তুফানে উল্টে গেছে।'

'ধরে ফেল্ লাওটাকে শিগ্‌গির। দেখ, কোনো মানুষ জলে

ভাসতেছে কিনা ওটা আঁকড়ে। থাকলে তুলে নিতে হবে রে লাওয়ে', বলল পরাণ মাঝি।

অন্য পাশ থেকে পতিতপাবন আর ছটকু ঝুঁকে পড়ল ডোবা নৌকোটার দিকে। ওদের দেখাদেখি অন্য কয়েকজনও নৌকোর কিনারে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। প্রাণপণে সবাই আঁকড়ে ধরল উল্টে যাওয়া নৌকোটাকে।

'কি রে, মানুষজন আছে, কিছু দেখতে পেতেছিস?' আবার পরাণ মাঝি জিজ্ঞাসা করল।

'না বড় মাঝি, কিছুই তো দেখা যেতেছে না' বলল আলিমুদ্দিন।

'তবুও ধরে রাখ লাওখানাকে। যদি লাওয়ের কিনারা ধরে কেউ ভাসে, তবে তো তাদের দেখতে পাবিনে। লাও ছাড়লে তারা বেঘোরে মরবে', বলল পরাণ মাঝি।

কিন্তু উল্টোনো নৌকো ধরে রাখাও অসম্ভব। আলিমুদ্দিনের মনে হতে লাগল ওর দু'খানা হাতই বুঝি ছিঁড়ে যাবে দেহ থেকে।

'কেউ ভাসতেছ নাকি গো লাও-এর সাথে', গলা ফাটিয়ে চেঁচাল আলিমুদ্দিন, 'থাকলে সাড়া দাও গো। এ লাও ধরে রাখা যাবেনি।'

কে যেন তখুনি জলের মধ্যে থেকে আর্তনাদ করে উঠল! সে চিৎকার শুনে সবাই চমকে উঠল। তবে তো উল্টোনো নৌকো ধরে মানুষ ভেসে চলেছে!

'ওগো, তোমরা সবাই ধর গো লাওখানাকে', চেঁচিয়ে উঠল পরাণ মাঝি, 'ভেসে যেতে দিওনি গো। বেঘোরে মরবে তাহলে মানুষটা। ও আলিমুদ্দিন ভাই, তুই ধর এসে হালটা। আয় শিগ্‌গির।'

হামাগুড়ি দিয়ে আলিমুদ্দিন গিয়ে ধরল হাল। হাল ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে এসে অন্ধকারের মধ্যেই নৌকোর পাশ ধরে জলের মধ্যে নেমে পড়ল পরাণ মাঝি। কেউ ওকে কিছু বলার আগেই এ-কাজ করল ও।

প্রচণ্ড বেগে হু-হু করে ছুটে চলেছে নৌকো। হাতের বাঁধন একটু আলগা হলেই কোথায় ভেসে যাবে পরাণ মাঝি, সে কথা ও একবারও ভাবল না! দু-এক মিনিট মাত্র! তবুও মণ্টুর মনে হলো যেন এক যুগ। লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে নৌকোর পাশে এনে ফেলল পরাণ মাঝি। অন্যরা যেন এর জন্যই তৈরি হয়ে ছিল। সবাই হাত লাগিয়ে এক এক করে লোকটাকে আর পরাণ মাঝিকে তুলে নিল পাটাতনে।

নৌকোয় উঠেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেল। আর তার পাশে শুয়ে পরাণ মাঝি হাঁপাতে লাগলো।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে এমনভাবে বাঁচতে পেরেও লোকটা ক্লান্তিতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। পাটাতনের সঙ্গে তাকেই আপনার দেহ দিয়ে চেপে ধরে রাখলো পরাণ মাঝি।

হাল থেকে আলিমুদ্দিন চেঁচিয়ে বলল, 'ও বড় মাঝি, আমি হালে রইনু এখন। তুমি একটু জিরেন দাও। শরীলে আর কত সইবে?'

'সেই ভাল,' বলল পরাণ মাঝি, 'তুমি ডান বাগে চেপে রাখো হাল। সামনেই বাবার আক্রোশ, ভুলোনি কথাটা।'

হঠাৎ যেন তখুনি আবার এলোমেলো হয়ে গেল বাতাসের গতি! পাগলা হয়ে উঠল বৃষ্টি আর তুফান। প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে আচমকা আবার নৌকো মুখ ফিরিয়ে অন্যমুখো ছুটতে শুরু করল। চারপাশের ঢেউগুলো আবারও ক্ষ্যাপার মতো লাফালাফি শুরু করে দিল। নৌকোও দুলতে লাগল অসম্ভব।

এ ব্যাপারে অন্যরা ভয় পেলেও খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল পরাণ মাঝি, 'লাও-এর মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে গো পীর বাবা। তার দয়া হয়েছে! হাল শক্ত করে ধর হে আলিমুদ্দিন। ঘুর্ণি লেগে আর যেন লাও-এর মুখ ফিরে না যায়।'

আরও আধঘণ্টা বাদে হঠাৎ চারদিক ঘিরে আবার কেমন যেন একটা অদ্ভুত আওয়াজ উঠল। সে আওয়াজ যেন চারদিকের



অন্য সমস্ত আওয়াজকে শুষে নিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। যেন একটা ভীষণ দৈত্য কোনো রাজপুত্রের কাছে যুদ্ধে হেরে সারা শরীরে আঘাতের ব্যথা নিয়ে রাগে গর্জন করতে করতে পালাচ্ছে। বীভৎস সে আওয়াজ! এ আওয়াজ থামলেই সারা পৃথিবী জুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে আসবে এখুনি। শান্ত হয়ে যাবে আশপাশ!

পরাণ মাঝি চেঁচিয়ে উঠল, 'হুঁসিয়ার! সবাই লাও আঁকড়ে ধর গো শক্ত করে। খুব শক্ত করে।'...বাকি কথাগুলো ওর আর শোনাই গেল না। চলে যাওয়া সেই শব্দের মাঝেই যেন তা হারিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড ঢেউয়ের দোলায় আবার নৌকোটা বার বার আকাশের দিকে লাফাতে লাগল। যেন যাবার আগে দৈত্যটা ওকে নিয়ে একবার শেষ ভয়ঙ্কর খেলা খেলে নিচ্ছে। ঝড়ের বেগও চরমে উঠল। বাতাসের ধাক্কায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো গায়ে এসে তীরের মত বিঁধতে আরম্ভ করল। এ যেন শেষ বারের মতো শেষ চেষ্টায় মেতেছে তুফান। এতগুলো মানুষ সামান্য একটা নৌকোয় চড়ে ওকে ফাঁকি দিয়ে পৌঁছে যাবে ঝড়খালি, এ যেন ওর অসহ্য!

কোনো মতে পাটাতনের কাঠ ধরে নিজেকে নৌকোর সঙ্গে আটকে রাখল মণ্টু। তারপরেই বড় বড় ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ল নৌকোর ওপরে। জল আর জল চারদিকে। ওর মনে হলো, নৌকো বোধ হয় ডুবেই গিয়েছে। নাকে-মুখে ওর নোনা জল ঢুকে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার মতো অবস্থা। আর বোধহয় কোনো আশাই নেই। তখনি মনে হলো ওর, সেই ভয়ঙ্কর বিশ্রী শব্দটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে!

হুড় হুড় করে জল নেমে গেল নৌকোর উপর থেকে। হাঁপাতে হাঁপাতে নিঃশ্বাস নিতে লাগল মণ্টু। না, এখনও নৌকো ডোবেনি! ঐ তো আলিমুদ্দিন হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো।

কিন্তু একি! সেই ভীষণ বৃষ্টি তো আর নেই! ঝড়ের বেগেও বাতাস বইছে না! নৌকোও তো আর পাগলের

মতো ছুটে চলছে না! সেই বিশ্রী শব্দটা দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে! কি হয়েছে? ব্যাপার কি? হঠাৎ দূর আকাশে মেঘের গর্জন শোনা গেল। এতক্ষণ তো এ শব্দও শোনা যায়নি। বৃষ্টি যদিও এখনো পড়ছে কিন্তু এ তো অতি সাধারণ বৃষ্টি। তবে কি ঝড় থেমে গিয়েছে! নৌকোর আর কোনো বিপদ নেই! আনন্দে মন্টুর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল।

তখুনি পাশ থেকে পতিতপাবন চিৎকার করে উঠল, 'জয় দরিয়ার পীর বাবার জয়! তুফান আমাদের পেরিয়ে গেছে গো, বড় মাঝি!' কোনোমতে ও দাঁড়িয়ে উঠে নৌকোর ওপরে নাচতে লাগল।

সেই বিশ্রী আওয়াজটা দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। নাচতে নাচতে পতিতপাবন চেঁচাতে লাগল, 'আমরা অক্ষে পেয়েছি! আমরা অক্ষে পেয়েছি! জয়, দরিয়ার পীর বাবার জয়।'

ওদিক থেকে কবীর সাহেবের গলা শোনা গেল, 'আমরা সবাই ঠিক আছি তো? দেখ, দেখ আগে। তারপর নয় নেচো।'

ওর একথা শুনে আবার ভয় হলো মন্টুর। এতক্ষণ ও শুধু নিজের কথাই ভাবছিল। অন্য আর কারও কথা মনে ছিল না ওর। এখন সবার কথাই মনে পড়ল। শেষ ঢেউয়ে কাউকে তো ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি? ভয়ে ওর সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে মনে ও বলল, 'হে দরিয়ার পীর বাবা, দয়াই যদি করলে তো আর কষ্ট দিও না আমাদের। সবাই যেন নৌকোয় থাকে।'

কারা যেন উঠে বসল পাটাতনের ওপরে। আবারও এক এক করে সবার নাম ধরে কবীর সাহেব ডাকতে লাগলেন, 'সিধু, কোথায় তুমি?'

'এখানে আমি, চাচা।' বলল সিধু।

'ডাক্তারবাবু, আপনি কোথায়?'

'আমিও ঠিক আছি, কবীর সাহেব।'

'আরসাদ ?'

'আছি সাহেব।'

ছটকু আর বিশে তাদের নাম ডাকার আগেই বলে উঠল, 'আমরা তো আছিই সাহেব, কিন্তু বড় মাঝি কই! বড় মাঝি আর সেই মানুষটা!'

সবাই তাকিয়ে দেখল নৌকোর পাটাতনে আর সকলেই আছে, নেই কেবল দু'জন। সেই ভেসে-আসা মানুষটা আর পরাণ মাঝি!

পতিতপাবন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। 'ও পীর বাবা গো, এ তুমি কি কল্লে বাবা! এ কি কল্লে!'

নৌকোর এদিকে ওদিকে ও পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। ও বোধ হয় লাফ দিয়ে নৌকো থেকে জলে পড়তে যাচ্ছিল। ছটকু আর বিশে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ধরে ফেলল।

'কি পাগলামি করতেছ, পতিতপাবন ভাই। একটু থির হও। ঝড় থেমেছে। এপাশ ওপাশ খুঁজে দেখতে হবে কোথায় বড় মাঝি। আমরা তাকে তুলে নেব জল থেকে।' বলল বিশে।

'ছেড়ে দে তোরা আমাকে, ছেড়ে দে।' বলল পতিতপাবন, 'বড় মাঝি যে দিকে গেছে, আমিও যাব সে দিকে।'

ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল ও।

যে আনন্দে সবার মন ভরে উঠেছিল, তা যেন এক মুহূর্তে ঐ নদীর জলেই ডুবে গেল। পরাণ মাঝি নেই! রাক্ষুসে ঝড় তাকে টেনে নিয়ে গেছে! এমন ভীষণ অন্ধকারে কোন দিকে খুঁজবে ওরা তাকে। ঝড় থামলেও নদীর জলের স্রোত তো কমেনি। এতো স্রোতে মানুষ পড়লে বাঁচে! কোন দিকে নৌকো ভাসিয়ে খুঁজবে ওরা?

ছটকু হঠাৎ বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ও বড় মাঝি গো-ও-ও-ও—কোন দিক পানে তুমি? সাড়া দাও গো-ও-ও-ও।'

ও থামতেই বিশে চিৎকার শুরু করল।

এত কাণ্ডের মধ্যেও আলিমুদ্দিন হাল ধরে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। কান পেতে রয়েছে ও কোনো দিক থেকে ডাকে সাড়া আসে কিনা। সাড়া পেলেই নৌকোর মুখ ও সেদিকে ফিরিয়ে দেবে। কান্নাকাটি পরে হবে'খন। এখন সমস্ত মন ওর এই হালের ওপর রাখতে হবে। তার ওপরেই বড় মাঝির বাঁচা-মরা।

'ও বড় মাঝি গো-ও-ও-ও। সাড়া দাও গো-ও-ও-ও।' চেঁচাতে লাগল ছটকু আর বিশে।

'দাঁড় ধর। দাঁড় ধর, তোরা,' হেঁকে উঠল আলিমুদ্দিন। 'আপনারা চেঁচান গো, বাবু মশাইরা। বড় মাঝি ডোবার বান্দা লয়। সাড়া দিলেই দাঁড়ের টানে লাও আমি ভিড়িয়ে দেব ঠিক তার পাশে।'

চারখানা দাঁড় আবার পড়ল জলে। আরসাদও হাত লাগিয়েছে দাঁড়ে। বড় মাঝিকে বাঁচাতেই হবে। এ ভীষণ ঝড়ে সেই তো বাঁচিয়েছে সবাইকে। তাকে ফেলে কোথাও যাওয়া হবে না। নদী তোলপাড় করে খুঁজতে হবে।

ডাক্তারবাবু আর কবীর সাহেব গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলেন। দাঁড়ি ধরে চারজনে উদগ্রীব হয়ে বসে রইল। সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণপণে টান দেবে ওরা দাঁড়ে।

মন্টুও গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও পরাণ মাঝি, কোন দিকে তুমি। সাড়া দাও। নৌকো নিয়ে আমরা আসব।'

জলের একটানা শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই শোনা গেল না।

দাঁড় ধরে বসে আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল পতিতপাবন, 'কেন আমি বড় মাঝিকে চেপে রাখলুম না। ছেল তো আমার পাশেই। ধরলে তো এমনটি হতো নি। এখন মুখ আমি দেখাব কেমন করে?'

সিধু আবার চেঁচিয়ে উঠল পরাণ মাঝির নাম ধরে।

ওর চিৎকারের মাঝেই নৌকোর খোলের মধ্যে থেকে কে যেন

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে তাকে ঠিক ভূতের মত দেখাল।

পতিতপাবন চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই দেখ! আমরা বলে কেঁদে মরতেছি। আর তুমি কিনা লাও-এর খোলে ঘাপটি মেরে বসে আছো? কেমন মানুষ গো তুমি, বড় মাঝি!' বলে ও কান্নাভরা গলায় হো-হো করে হেসে উঠল।

'বলি খোলের জল মাপতে ছিলে নাকি গো, বড় মাঝি?' বলল ছটকু। এ কথায় হাসির ছোঁয়াচ লাগল সকলের। সবাই হাসতে লাগল প্রাণ খুলে।

'বেশ রঙ্গ জানো তো গো, বড় মাঝি!' হালের কাছ থেকে বলল আলিমুদ্দিন।

রাগে বড় মাঝি বলল, 'রঙ্গ কিসে! বেহুঁস মানুষটা ভেসে যেতনি জলে? লিরুপায় আমি ওকে জাপটে ধরে গড়িয়ে পড়েছিনু খোলের মধ্যি, তবেই না সব্বো রক্ষে। তা বাপু মিথ্যে বলবনি, আমারও কেমন যেন একটু ভির্মি নেগেছিল। তাতেই না এত কাণ্ড। একেবারে মড়া কান্না জুড়ে দিয়েছিস!'

ওর রাগ দেখে সবার হাসি বেড়ে গেল। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার অবস্থা।

বেহুঁস মানুষটাকে তুলে সবাই পাটাতনে শুইয়ে দিল। সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেখল পরাণ মাঝি, 'না, কোথাও ওর চোট লাগেনি। তুফানের সঙ্গে যুঝে ক্লান্তিতে ও বেহুঁস হয়েছে, এখুনি হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু এমন করে বসে থাকলে চলবে না। সামনে এখনও অনেক পথ বাকি। আবার যদি তুফান ওঠে তো আর কারো গতরে কুলাবে না। যা কিছু করার এখনই করতে হবে! নৌকোর ওপরে দাঁড়িয়ে উঠে পরাণ মাঝি আবার হুকুম দিতে লাগল।

কখন বৃষ্টি থেমে গেছে কেউ খেয়াল করেনি। হাওয়াও প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। রাতের গভীর অন্ধকারে চারদিক নিস্তব্ধ।

কে বলবে, কিছুক্ষণ আগেই এখানে প্রলয় হয়ে গিয়েছে। একদল লেগে গেল সেচে। অন্যরা থেকে থেকে দাঁড় টানছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে এলেও সবাই খুশি মনে পরাণ মাঝির হুকুম তামিল করছে।

ওরই মধ্যে ছটকু গান ধরলে—

'রূপ যদি তোর ভাল, মাগো
মুণ্ডমালা কেন তবে তোর গলে।
দয়াবতী নাম যদি তোর
শিব কেন তোর পদতলে।
মা গো······'

দু'চার বার ধমক দিয়েও সে গান থামাতে পারেনি পরাণ মাঝি। শেষে নিজেই তারিফ করে বলেছে, 'গলা তোর বেজায় মিষ্টি রে ছটকু। তুই লাও বাওয়া ছেড়ে যাত্রাদলে সখী সাজ গে যা, লেচে লেচে বেশ গাইবি তাহলে। বাহবা পাবি সবার।'

আলিমুদ্দিন এক সময়ে বলল, 'বড় মাঝি, হাল ধরবে নাকি গো? তাহলে আমিও দাঁড়ে বসতে পারি।'

'না না,' বলল পরাণ মাঝি, 'ও হাল তোর হাতেই থাকবে আলি ভাই। লাও তো বেশ চলতেছে। ও আর আমার কাজ লয়। এবারে আমার ছুটি রে। এ তুফান বুঝিয়ে দিয়েছে, আমার আর বয়স নেই রে! এখন এ দরিয়ায় পারাপারের ভার তোর হাতেই আলিমুদ্দিন।'

আলিমুদ্দিন বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কি বলতেছ গো বড় মাঝি!'

'ঠিক বলতেছি,' বলল পরাণ মাঝি, 'যুগ্যি লোক বটে তুই। আমায় ছুটি দিয়েছেন দরিয়ার পীর বাবা। তুই না বলার কে?'

'বড় মাঝি গো ও-ও······' কি বলতে গিয়েও বলতে পারল না আলিমুদ্দিন। গলা ওর বন্ধ হয়ে গেল। হালটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে উদাস আলিমুদ্দিন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরাণ মাঝি মানুষ নয়, দেবতা! দেবতা না হলে এমন হয়!

পূবের কোলে কি আলোর সাড়া জাগল? সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাঁকল পরাণ মাঝি, 'ডাইনে কাটান দাও হে, লতুন বড় মাঝি, ডাইনে। আমরা বোধ হয় ঝড়খালি এসে গেইচি। তোমরা আবার থামলে কেন গো। শেষ টান লাগাও দাঁড়ে। আরে ছটকু, গলাটা তোর খুব মিষ্টি মনে হতেছিল, তা গাওনাটা থামিয়ে দিলি কেন, ধর আবার।'

মনের সুখে গান ধরল ছটকু—

'আমি লাও ভাসালাম মাঝ দরিয়ায়
বন্ধু হে এ-এ-এ......'

একটু একটু করে আলো বাড়তে লাগল। আকাশ ভরা তখনো মেঘ, সূর্য আজ আর বোধ হয় দেখা যাবে না। ঝাপসা আলোয় দূরে জলের সীমানায় অস্পষ্ট নদীর তীর দেখা গেল।

আরও গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল ছটকু—

'তোমারি ভরোসায়।
আমি লাও ভাসালাম মাঝ দরিয়ায়,
বন্ধু হে এ এ এ......'

হুঁস ফিরে এল সেই লোকটার। ঠাণ্ডা বাতাসে সবার তখন শীতে কাঁপুনি ধরেছে। ঠকঠক করে কাঁপছে সবাই।

'কি নাম গো তোমার?' জিজ্ঞাসা করল পরাণ মাঝি।

'অধমের নাম গিয়ে জালালউদ্দিন,' বলল লোকটা।

'ঘর কোথায়?'

'বাঘমারির চরে গো।'

'এ তুফানে লাও ভাসিয়েছিলে কেন?'

'মাছ মারব বলে। ঘরে খোরাকী ছেল না তাই।'

'সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

প্রশ্ন শুনে লোকটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'ছেল গো ছেল, ভাই আব্বাসউদ্দিন। দরিয়ার পীর বাবা তাকে নেছে।'

গান থামিয়ে দিল ছুটকু। আবার সবার মন ব্যথায় ভরে উঠল। আহা, দুমুঠো ভাতের জন্যই এমন তুফানেও এই দরিয়ায় নাও ভাসাতে হয়!

পরাণ মাঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সবই অদ্দেষ্ট! কেঁদে আর কি করবে গো, ভাই।'

নদীর তীরের দিকে তাকিয়ে সবাই চম্‌কে উঠল। ভোরের আবছা আলোয় দেখল, কী ভীষণ কাণ্ড হয়ে গিয়েছে ওখানে। অধিকাংশ বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে ঝড়ে। চারদিকের সব কিছু ভাঙা তছনছ। বড় বড় নৌকোগুলো তীরের অনেক উঁচুতে কাদায় গেঁথে গেছে। গাছপালা সবই প্রায় মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর সেই ভয়ঙ্কর ভাঙ্গাচোরার মাঝখানে অসহায়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে কতগুলো মানুষ, একটা ঝড়েই যাদের সব কিছু গেছে!

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরাণ মাঝি। বলল, 'সব্বোনাশ হয়ে গেছে দেখতেছি! এখানেই এমন, চরগুলোতে না জানি কি ভীষণ কাণ্ড হয়েছে। আঃ হা হা হাঃ, একি করলে গো দরিয়ার পীর বাবা।'

নৌকো এসে তীরে ভিড়ল। লাফ দিয়ে পতিতপাবন নেমে পড়ল কাদায়। নৌকোর রশিটা টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে দিল একটা উপড়ে পড়া গাছের সঙ্গে।

'আমরা এসে গেইছি গো।' চেঁচিয়ে উঠল ও! তারপর হাত ঠেকাল কপালে। বোধ হয় দরিয়ার সেই পীর বাবার উদ্দেশ্যেই।

পরাণ মাঝি হেঁকে উঠল, 'লাবুন গো আপনারা সবাই, লাবুন। এবেরে আমি দায়মুক্ত হলাম। একি যে-সে দায়—মানুষের পরাণের দায়! দয়া পীর বাবার।' ভক্তিভরে ও-ও কপালে হাত ঠেকাল।

ঝড়ে নৌকোর তক্তাটা উড়িয়ে নিয়েছে। লাফ দিয়ে এক এক করে সবাই নামল কাদায়। পায়ের নিচে মাটি পেয়ে কেমন করে উঠল সবার মনের মধ্যে। মাটি এত সুন্দর! এত আরামের!

তীরে ভাঙ্গা ঘর বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে কয়েকজন মানুষ তখন অবাক হয়ে দেখছে ওদের সকলকে। এমন তুফান মাথায় করে এরা এল কোথা থেকে?

কবীর সাহেব বললেন, 'চল, আমরা এখন সবাই অতুল ডাক্তারের বাড়ি যাই। অতুল আমার বন্ধু। তারপর যা হয় করা যাবে।'

আর কেউ পেছন দিকে ফিরেও তাকাল না। পারের কাদা ভেঙ্গে উঠে এল ওপরে। তারপর ভাঙ্গা ঘর বাড়ি পার হয়ে গঞ্জের পথ ধরে এগোল অতুল ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

পিছনে রইল পড়ে পরাণ মাঝি, আলিমুদ্দিন, পতিতপাবন, ছটকু আর বিশে। পড়ে রইল সেই মানুষটা, ঝড়ে যে তার ভাইকে হারিয়েছে।

আসার আগে মাঝিদের কিছু বলবে ভেবেছিল মণ্টু, সিধুও কেন একবার থেমেছিল চলতে গিয়ে যেন, কিন্তু সারা শরীরে তখনি ওদের ধরল কাঁপুনি। শীতের নয়। ক্লান্তিরও নয়। বোধ হয় শক্ত মাটির ছোঁয়া পাওয়ার সুখে। আর থামতে পারেনি ওরা।

সবাই এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। এমন কি ডাক্তারবাবুও। ওরাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল তাদের সঙ্গে অতুল ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

দুপুরে রেডিওর খবরে ওরা শুনল, কলকাতা থেকে বলছে, —'আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার খবরে জানা গেছে, কালকের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে পশ্চিম বাঙ্গলার দক্ষিণ অঞ্চলের কয়েক জায়গায় প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির নাম—মজিদ মিয়াঁর চর, বাঘমারির চর, কোদালীয়া আর ঝড়খালি। প্রচণ্ড ঝড়ে সমুদ্রের জল কোনো কোনো জায়গায় দশ বার মিটারের

মতো উঁচু হয়ে এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ঐ সব অঞ্চলে প্রাণহানিও ঘটেছে। বহু গৃহপালিত পশুও প্লাবনে ভেসে গিয়েছে। সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ধারণাতীত। মজিদ মিয়াঁর চরে যে হাওয়া অফিস ছিল, সম্ভবতঃ তা ধ্বংস হয়েছে। সেখানে কর্মরত সরকারি কর্মচারিদের সম্বন্ধেও কোন খবর পাওয়া যায়নি। বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আবহাওয়ার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি করা হবে। সৈন্যবাহিনীর কাছে উদ্ধার কাজের জন্য হেলিকপ্টর চাওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আজই পুরো দমে উদ্ধার কাজ সুরু করা যাবে। জেলাশাসক নিজেই ঝড়খালি যাত্রা করছেন। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন।'

কবীর সাহেব বহু কষ্টে পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, 'রেডিওটা বন্ধ করে দাও তো, মণ্টু। ও চিৎকার আর শুনতে ভাল লাগছে না।'

শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল মণ্টু। চুপি চুপি বাবাকে বলল, 'বাবা, আমরা তো আসার সময় মাঝিদের কিছু বলে আসিনি। ওদের জন্যই তো আমরা বেঁচেছি।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আগে তোমরা একটু সুস্থ হয়ে নাও, তারপর নয় গিয়ে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এসো ; সত্যিই তো, ওরা না থাকলে আমাদের মজিদ মিয়াঁর চরেই মরতে হত বেঘোরে।'

সিধু চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, 'এই মণ্টু, আবার যদি আজ তোকে মজিদ মিয়াঁর চরে যেতে বলে, তুই যাবি ?'

মণ্টু বলল, 'হ্যাঁ, যাব। আবার যাব। যা একটা এ্যাডভেঞ্চার হল না, উঃ! মনে থাকবে চিরকাল।'

—